অনীক

নভেম্বর ২০১৪
বর্ষ ৫১ □ সংখ্যা ৫
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

অক্সফ্যাম রিপোর্ট ❑ মানস ❑ ২
বেসরকারিকরণের বেহিসেবি... ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৪
সব চরিত্র বাস্তব ❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ৬

ফিরে দেখা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ:১০০ বছর পর ❑ সহদেব মন্ডল ❑ ৮
একটি গণহত্যার তিরিশ বছর ❑ তড়িৎ চৌধুরি ❑ ৯

প্রবন্ধ

#হোক কলরব ❑ অরিজিৎ ❑ ১১
শ্রম আইন সংশোধন প্রসঙ্গে ❑ কুশল দেবনাথ ❑ ১৬
ভারত রাষ্ট্রে শ্রম আইন ❑ কৌশিক ভট্টাচার্য্য ❑ ১৯
মার্কিন রোষানলে ভারতীয় ওষুধশিল্প ❑ প্রদীপ রায় ❑ ২০
ঠিকাশ্রমিক ও কয়লাশিল্পের কথা ❑ প্রশান্ত হালদার ❑ ২২
তেজোময় ভারত ❑ দারা-শুকো ❑ ২৮
...ভারতে কৃষি-সম্পর্কের পরিবর্তন ❑ প্রণব দে ❑ ৩৫

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

ঘনীভূত বিপদ

টিভি খুললেই এখন দেখা যাচ্ছে, ম্যন্যগণ্য ব্যক্তিরা নতুন ঝাড়ু হাতে পাশাপাশি লাইন করে রাস্তা পরিষ্কার করছেন, অবশ্য যতক্ষণ ক্যামেরা চলছে, ততক্ষণই। প্রধানমন্ত্রীর নতুন যোজনার নাম 'স্বছ ভারত'। ভারতবর্ষে প্রায় ৬০ শতাংশ (সংখ্যায় আনুমানিক ১০ কোটি) গ্রামীণ পরিবারের বাসস্থানে শৌচাগার এবং স্নানাগার নেই। এখনও এদেশে মনুষ্য-বর্জ্য বহনকারীরা নির্মূল হয়নি, খুদে শিশুরা আবর্জনা কুড়িয়ে দিন গুজরান করে। মোদী সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত' দেশের দৈন্য-দারিদ্র্য সমাধানের ইঙ্গিত দিক না দিক, সংস্কার-সম্মার্জনীর আঘাতে 'অচ্ছে ভারত' থেকে এই প্রান্তিক মানুষগুলোর বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। অর্থনৈতিক এবং কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী এবং মনমোহন সিং সরকারের এজেন্ডাগত ফারাক সামান্যই। বলা যেতে পারে মনমোহন সিং সরকারের অসমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছে মোদী সরকার।

কিন্তু আসল বিপদটা আসছে অন্য দিক দিয়ে। *আরএসএস* এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মেরুকরণের প্রচেষ্টা চলছে। দল এবং সরকারে শুধু যে *আরএসএস* নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, নরেন্দ্র মোদীর অনুগতরাই কেন্দ্র ও ক্ষমতাধীন রাজ্য সরকারে অধিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ ক্রমশ এক গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসনপ্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং সর্বোপরি এই গোষ্ঠীতন্ত্রের সামাজিক অনুমোদন নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে ঘনীভূত বিপদ এটাই।

বিজেপি বর্ণবাদীদের দল। উচ্চবর্ণ ও উচ্চ সম্প্রদায়ের মোটামুটি একমুখী ভোটদান এবং অপরদিকে দলিত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহ প্রান্তিক মানুষের ভোট বিভাজনের দৌলতেই বিজেপি শিখরাসীন। কর্পোরেট পুঁজির এবং অধুনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও সব থেকে আস্থাভাজন ব্যক্তি এখন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আস্থা মোদী তথা বিজেপি অর্জন করতে পারেনি। সম্ভবত মোদী এবং *আরএসএস* গোষ্ঠী সে চেষ্টাও করছে না। *বিজেপি-আরএসএস*-এর লক্ষ্য উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক বিভাজন এবং তারই জন্য আয়োজন চলছে ইতিহাস পুনর্গঠনের, শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৈরিকীকরণের। গুজরাট মডেলে জাতপাত, সম্প্রদায়গত বিভেদে মদত দিয়ে, সামাজিক বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক বিভাজনকে আরও বিস্তৃত করা হচ্ছে।

মৌলবাদের প্রসার, গৈরিকীকরণের উদ্যোগ, ধর্মীয় জিগির সৃষ্টি— এ সবের পিছনে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ একটাই— শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে আচ্ছন্ন করা এবং তাদের সংহতি বিপন্ন করা। ফলত দিল্লির ত্রিলোকপুরীর মতোদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তুচ্ছ কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রান্তিক সমাজকেও সেই উত্তেজনা স্পর্শ করছে। শ্রমজীবী মানুষের লড়াইটা এখন তাই দুটি ফ্রন্টে। একদিকে উদারনীতির আক্রমণ ও কর্পোরেট লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, অপরদিকে সংহতি বিরোধী মৌলবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। এই দ্বিমুখী লড়াইটা শ্রমজীবী মানুষের একার লড়াই না। বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সমাজের সম্মিলনে এটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিশীল এক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।

কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নির্বাচনী জোট গড়ে প্রতিক্রিয়ার এই আক্রমণ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। লড়াইটা লড়তে হবে সংসদের বাইরে— শ্রেণী-সংগ্রামের ময়দানে। যেমনটা লড়েছিল মারুতি-সুজুকি-র শ্রমিকরা, যেমনটা লড়েছে জগৎসিংহপুর, নন্দীগ্রাম, নিয়মগিরির অধিবাসীরা। সংগ্রামই গড়তে পারে পাল্টা সংস্কৃতি, শ্রেণীগত সংহতি। বামেরা কি পারবেন, সংসদ ছেড়ে এইসব সংগ্রামে সামিল হতে? বামপন্থীদের পুনরুত্থানের এটাই কিন্তু সুযোগ।

ঘটনাপ্রবাহ

অক্সফ্যাম রিপোর্ট ও অর্থনৈতিক অসাম্য নিয়ে কিছু কথা

মানস

একটি ডিনার টেবিলে তিনজন বসে। একজন সিইও, একজন রাজনীতিবিদ আর একজন শ্রমিক। সামনের প্লেটে ১২টি মাংসের টুকরো। সিইও ১১টি তুলে নিলেন আর রাজনীতিবিদকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, ওই শ্রমিক কিন্তু তোমার ওই একটা টুকরো কেড়ে নিতে চাইছে। আর তারপর দ্রুত টেবিলে ফিরে এসে শ্রমিককে বললেন, তোদের ওই নেতা কিন্তু তোর ওই মাংসের পিসটা বাগাতে চাইছে, সাবধান। ঘটনাটা এরকমভাবেই বছরের পর বছর চলতে থাকে। যদি ১২টার জায়গায় ২৪টা মাংস থাকে তাহলে সিইও পায় ২৩টি। কয়েক বছর পর যদি উৎপাদন চীন দেশে পাঠিয়ে দেওয়ায় প্লেটে আসে ২৪০টা পিস, তাহলে সিইও নেবে ২৩৯.৫টি পিস। পারিষদগণ বলবেন, সিইও-র জন্যই তো এত উন্নতি, তাহলে উনি কেন এতটা পাবেন না বলুনতো? পারিষদগণ, যাঁরা হলেন তাঁদের তাঁবেদার অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ— এঁরা পাল্টা গল্প ফাঁদবেন। এক দরিদ্র চাষির বাড়ির পাশে এক ধনী ব্যক্তি থাকতেন। ওই ধনী ব্যক্তি বাড়িতে একটি দুধেল গাই নিয়ে আসেন। তা নিজের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করার জন্য ওই দরিদ্র চাষি ভগবানকে আকুলভাবে ডাকতে থাকেন। অনেক প্রার্থনার পরে যখন ভগবান এসে ওই গরিব চাষিকে জিজ্ঞেস করলেন সে কী চায়, তখন ঐ হতদরিদ্র চাষি কী চাইলেন? না, ভগবান আপনি এমন কিছু করুন যাতে পাশের বাড়ির ধনী লোকটির গরুটা মরে যায়। অর্থাৎ ট্যাক্স-ফ্যাক্স বসিয়ে বড়লোকদের 'কষ্টার্জিত' সম্পদ কেড়ে নিয়ে দানধ্যানের কথা ফাঁদবেন না। এমনিতেই গরিবগুলো কুঁড়ে, কাজ করতে চায় না, তায় আবার আপনাদের খালি দানছত্রের কথা।

মনে পড়ে যায় তামিলনাড়ুর সরকারের জনদরদি নীতি নিয়ে এক অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য। তামিলনাড়ুতে এক জায়গায় অত্যন্ত অল্প মজুরিতে শ্রমিকদের খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। এবার সেখানে কিছুদিন পরে কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছিল না। ওই অর্থনীতিবিদ বিশ্লেষণ করে যথারীতি সিদ্ধান্তে এলেন, এ সকলের মূলে আছে সরকারি নীতি। ওই অর্থনীতিবিদদের মতে, এইসব গরিবগুর্বো খেটে খাওয়া শ্রমিকের দল এমনিতেই কুঁড়ে। তায় আবার সরকার এদের রেশনে সস্তায় চাল-ডাল দিচ্ছে। এমনকি সরকার এদের টিভিও দিয়েছে। তাই এই কুঁড়ের বাদশাগুলো একদিন কাজে আসছে আর বাকি দিন ওই রেশনের চাল ডাল খেয়ে টিভি দেখে কাটিয়ে দিচ্ছে। তাই কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছেনা।

এরকম বার বার বহু জায়গায় সরকারি আমলাদের কাছ থেকে শোনা গেছে যে দারিদ্র্যের পেছনে কারণ হচ্ছে কৃষক ও শ্রমিকদের কুঁড়েমি। আর তাই যদি হয় তবে ২৪ ঘণ্টা খাটতে খাটতে খাবি খেতে থাকা সিইও-রা 'একটু বেশি মাইনে' পেলেই দোষ হয়ে গেল? সিইও-দের এই 'একটু বেশি মাইনে' আর উদ্যোগপতিদের (বা উদ্যোগপত্নীদের, তবে পৃথিবীর প্রথম কয়েকজন ধনীদের মধ্যে মহিলা আছেন কি?) 'একটু বেশি মুনাফা' কামানোর ব্যাপারটা ঠিক কীরকম? এই 'একটু বেশি'-টা ঠিক কতটা বেশি? আর এই 'একটু বেশি'-র ফলস্বরূপ পৃথিবীতে অর্থনৈতিক অসাম্য বা আয়ের অসাম্যের চেহারাটা ঠিক কতটা বীভৎস হয়ে উঠেছে সেই নিয়েই ২০১৪-র 'অক্সফ্যাম রিপোর্ট' (Workng for the Few, 2014)। এই লেখায় আমরা এই রিপোর্টটি থেকে তথ্য ঘেঁটে পৃথিবীতে বিরাজমান এবং ক্রমবর্ধমান অসাম্যের চেহারাটা বুঝে নেব।

অক্সফ্যাম রিপোর্টের মূল প্রতিপাদ্য

২০১৪-এ এসে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ৮৫ জন ধনী ব্যক্তির মিলিত সম্পদের পরিমাণ পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যার মিলিত সম্পদের সমান। আজকের পৃথিবীতে ১০ জনের মধ্যে ৭ জন মানুষ এমন দেশে বাস করেন যেখানে গত ৩০ বছরে অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়েছে। সর্বাধিক ধনীদের মধ্যে প্রথম ১ শতাংশ আবার তাদের সম্পদের অংশ ১৯৮০ থেকে ২০১২-এর মধ্যে মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে নিয়েছে। আমেরিকায় এই ১ শতাংশই ২০০৮-এর অর্থনৈতিক সঙ্কট-পরবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ৯৫ শতাংশকে দখল করেছে, অন্যদিকে তলার ৯০ শতাংশ মানুষ আরও দরিদ্র হয়ে গেছেন।

এই তথ্যগুলি থেকে এই রিপোর্টটির দাবি হল বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই এখন 'অত্যধিক অসাম্য'-র পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এর পরিচয় পাওয়া যায় আরও কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের মাধ্যমে। গত বছর বিশ্বে বিলিওনেয়ারের লিস্টে নতুন সংযোজন ২১০ জন। এঁরা যুক্ত হলেন ১,৪২৬ জনের বিলিওনেয়ারদের শ্রেণীতে, এঁদের মোট সম্পদের পরিমাণ ৫৬৪ ট্রিলিয়ান (৫,৬৪,০০,০০০ কোটি) মার্কিন ডলার। পৃথিবীর এই 'অত্যধিক অসাম্য'-র পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, সেনসেক্স, সিইও-দের মাইনে, মালিক শ্রেণীর মুনাফা ইত্যাদি প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করছে। বিশ্বের ১ শতাংশ সর্বাধিক ধনীদের ঘোষিত সম্পদের মোট পরিমাণ আজ ১১০ ট্রিলিয়ান (১,১০,০০,০০০ কোটি) মার্কিন ডলার, যা কিনা নিচুতলার অর্ধেকের সম্পদের সমষ্টির ৬৫ গুণ বেশি।

ভারতেও গত দশ বছরে বিলিওনেয়ারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬ থেকে ৬১ জন।

চিত্র - ১ **ধনীর আরও ধনবৃদ্ধি হচ্ছে**

ধনীদের এক শতাংশের আয় বৃদ্ধি (শতাংশ)— ১৯৮০-২০১২

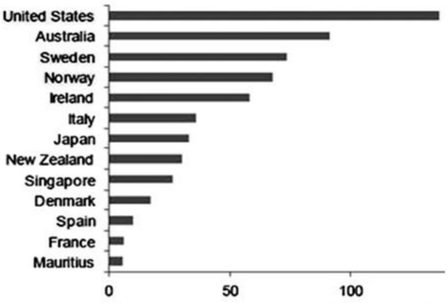

মোদ্দা কথাটি হলো, বড়লোকরা অতিদ্রুত অত্যধিক বড়োলোক হয়ে পড়ছেন। চিত্র - ১ গত তিরিশ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সর্বাধিক ধনী ১ শতাংশ-র আয়ের বৃদ্ধির হিসেব দিচ্ছে।

চিত্র - ২ **ধনীদের এক শতাংশ জাতীয় আয়ের যতটা ভোগ করেন**

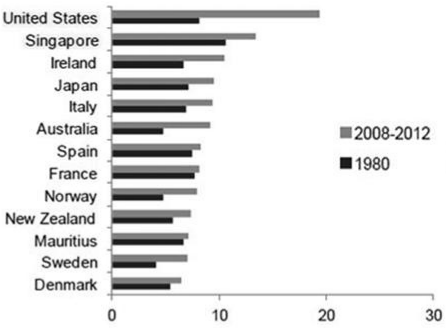

চিত্র - ২ থেকে সর্বাধিক ধনীদের আয়ের পরিমাণ দেশের মোট আয়ের অংশ হিসেবে কতটা তার হিসেবটি ধরা পড়ছে।

চিত্র - ৩ লেখচিত্রে ভারতের সর্বাধিক ধনীদের প্রথম ১০ শতাংশ-র আয়ের উর্ধ্বগতির কথা ধরা পড়েছে।

সমস্যাটি কোথায়?

মূলধারার অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলবেন, ‘‘বড়লোকরা বড়লোক হচ্ছেন তাতে আমাদের সমস্যাটা কোথায়? তাঁরা তো ‘পরিশ্রম করেই’, ‘মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই’ বড়লোক হচ্ছেন, নাকি? তাহলে তাতে আপনাদের কী বলার থাকতে পারে? আপনাদের বুঝি মধুভাণ্ড থেকে ভাগ না পাওয়ার জন্যে হিংসে হচ্ছে?’’ এবার

চিত্র - ৩ **ভারতের ধনী ও দরিদ্রের আয় বৃদ্ধির তুলনা**

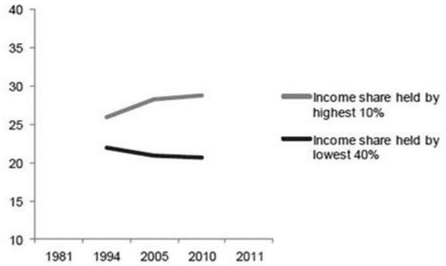

তাই আমরা অক্সফ্যাম রিপোর্টের হাত ধরেই বুঝে নেব যে বড়লোকদের এই অতিদ্রুত আরও আরও আরও ধনীতে পরিণত হওয়ার উপায়টাই বা কী আর এতে সমস্যাটাই বা কোথায়।

ওএলএক্স বা *কুইকার*-এ নতুন বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে যে ‘‘একটি সেকেন্ডহ্যান্ড দেশ বিক্রি আছে, ইচ্ছুক ক্রেতারা অতিদ্রুত যোগাযোগ করুন। তবে হ্যাঁ, এই অফারটি শুধুমাত্র বিশ্বের সর্বাধিক ধনী ১ শতাংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।’’

ওপরের বিজ্ঞাপনটি কাল্পনিক হলেও বাস্তবটা কিন্তু খুব একটা আলাদা কিছু নয়। আমেরিকায় ২০০৮-র অর্থনৈতিক সঙ্কটের (যার দায় অনেকাংশেই ওখানকার ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলির ফাটকাবাজির ওপর বর্তায়) পরে ফাটকাবাজি রদ করার জন্য একটি আইন বানানোর চেষ্টা করা হয়, যার নাম ‘ডড-ফ্রাংক বিল’। ২০১২-তে এই বিলটির উপর ভোটাভুটির সময়ে উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষাকারীরা পাঠান ২০ জন লবিস্টকে, আর অন্যদিকে ওয়াল স্ট্রিট থেকে পাঠানো হয় ৪০৬ জন লবিস্টকে— বিলটিকে পরাস্ত করার জন্য।

অতএব মোদ্দা কথাটি হলো, অর্থনৈতিক অসাম্য খুব বেড়ে গেলে সরকারি নীতিগুলি ধনীদের স্বপক্ষে কিনে ফেলার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, আমলারা সহজেই বিক্রি হয়ে যান, গণতান্ত্রিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অতি-ধনীরা কিনে ফেলতে পারেন, একটা দেশ পুরোপুরি বিক্রি হয়ে যেতে পারে। অতি-ধনীরা অবলীলায় দেশীয় সম্পদের উপর লুঠতরাজ চালাতে পারেন আর অন্যদিকে দেশের গরিব জনগণের প্রয়োজনীয় সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমাগত কমে যেতে পারে। ফলত দেশের বেশিরভাগ মানুষ জীবনধারণের মৌলিক অধিকারগুলি থেকেও বঞ্চিত হতে পারেন। আর এখানেই হচ্ছে সমস্যাটা।

হতাশার রিপোর্টে আশার আলো?

ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলস্বরূপ অসাম্যের পাহাড় নিয়ে হতাশার কথা শোনানোর পরে রিপোর্টটিতে আশার আলো হিসেবে বলা হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির কথা। ব্রাজিলের

উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেদেশের জনকল্যাণমুখী সরকারি নীতির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। যদিও এই রিপোর্টটিতে ভেনেজুয়েলার কথা বলা নেই। হয়তো বা ব্যাল্যান্স করার জন্য। জানা নেই। শুধু এটুকু জানা আছে যে এত অসাম্যে পরিপূর্ণ ব্যবস্থাটির পরিবর্তন অনিবার্য। নচেৎ এমন একদিন আসবে যেদিন শ্বাস নেওয়াটাও কেবলমাত্র অতি-ধনীদের পকেটস্থ অধিকার হয়ে দাঁড়াতে পারে!

Everybody knows the deal is rotten
Old black Joe's still pickin' cotton
For your ribbons and bows
And everybody knows.

বেসরকারিকরণের বেহিসেবি মজা

সমরেশ মিত্র

দিল্লির তখ্‌ত-এ আসীন হয়েই মোদি এবং টিম-মোদি ভারতের যাবতীয় জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে, অর্থাৎ তথাকথিত বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকরণের মাধ্যমে জনগণের টাকাপয়সা আত্মসাৎ করার জন্য উদ্যত হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে (২০১৪) মন্ত্রিসভার কমিটি অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স ভারতের তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা— *কোল ইন্ডিয়া, ওএনজিসি* এবং *এনএইচপিসি*-র বেশ কিছু শেয়ার বিক্রি করে ৪৪ হাজার কোটি টাকা তুলবে বলে দাবি করেছে! এদেশে এখন যতটা বাজেট ঘাটতি রয়েছে (জিডিপি-র প্রায় ৪.১ শতাংশ), এই অর্থ সেই ঘাটতি মেটাবে বলে মাননীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলি মহাশয় দাবি করেছেন।

মনমোহন সিংহ মহাশয়ের রাজত্বের শেষ পর্বে তিনি দেশের সম্পত্তি জলের দরে বিদেশি এবং তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের সন্দেহজনক সংস্থাগুলিকে 'বিক্রি' করে দেওয়ার কাজটি যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে রূপায়িত করেননি। ফলত লুঠেরা বিদেশি সংস্থা এবং তাদের খয়ের খাঁ-বৃন্দ ''গেল গেল'' রব তুলে ''গেরুয়া বিপ্লব''-কে মদত দেওয়ার জন্য মোদির পক্ষে হাত খুলে টাকা খরচ করে। রাজত্বে আসীন হয়ে এখন মোদির প্রতিদান দেওয়ার পালা। একনজরে আমরা দেখে নিই, প্রতিদান-এর জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত মোদি সরকার-এর পরিকল্পনাগুলি কী কী।

কাণ্ডজ্ঞানের একটি সরল কাহিনী দিয়ে শুরু করলে মোদীর পরিকল্পনাগুলি বোঝা সহজ হতে পারে। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে যদি অন্য ভাগীদারদের বঞ্চিত করার অভিপ্রায় থাকে তো আপনি কী করবেন? আপনি প্রথমেই আপনার পৈত্রিক সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্রেতাকে গিয়ে বলবেন যে, শুনুন হুজুর, আপনার জন্য আমি আগে মূল সম্পত্তির দামটা কমিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনি হুজুর, এই সচেতন দালালির পুরস্কার-স্বরূপ যে দামে বেচা-কেনার রফা হবে, সেই দামের ওপর একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ধরে আমাকে পুরস্কৃত করুন— এই ধরুন প্রতি কোটি টাকা বেচা-কেনা পিছু ১০ শতাংশ বা ১০ লক্ষ টাকা মাত্র! তবে কিনা আমাদের এই স্ক্যাম-রিপাবলিকে দালালির পরিমাণ দশ শতাংশের বেশ কয়েকগুণ বেশি! ঠিক এই পদ্ধতিতে টেলিকম কেলেংকারির নায়ক রাজা (ইনি ''পছন্দের ব্যবসায়ী''-দের কম দামে টেলিকম স্পেকট্রাম বেচে দিয়েছিলেন), তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী জয়ললিতা (ইনি সরকারি টাকায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিনেছেন, স্টারলাইট সংস্থাকে বেআইনিভাবে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন জমি, খনি ইত্যাদি হস্তান্তর করেছেন...) ইত্যাদিরা বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন!

বর্তমান দিল্লীশ্বরবৃন্দ এই দালালির গুণকীর্তনে যখন অর্থনীতির বৃহৎ তত্ত্বকে সালিশি মানছেন, সেই অবসরে আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক কী ফন্দিফিকির মাফিক এই মাফিয়ারা কাজ হাসিল করতে চাইছে। বেসরকারিকরণ-বিলগ্নিকরণের তালিকায় থাকা ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল বা *ভেল*-এর কাহিনী দিয়েই শুরু করা যাক।

মনমোহন সরকারের শেষ দফা থেকে বারে বারে ঘোষণা করা হচ্ছে যে *ভেল* সংস্থাটির বিলগ্নিকরণ ঘটবে। ফলে এপ্রিল ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৪, এই সময়সীমায় *ভেল* সংস্থার স্টকের মূল্য ক্রমাগত পড়তির মুখে। এদিকে সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে যে এই স্টক বেচে টাকা পেলে তবে নাকি সরকার ''উন্নয়নমূলক কাজকর্ম'' করতে পারবে! সরকার করুণ আবেদন রাখে যে সর্বকালের সর্বনিম্ন দরে এই উম্‌দা চিজ বিক্রির জন্য রয়েছে— অতএব মহানায়কবৃন্দ, দ্রুত এসে এই কমিয়ে রাখা দামে মহার্ঘ বস্তু ক্রয় করুন। কিন্তু বেসরকারি খেলোয়াড়রা চায় আরও কম দাম, অতএব তারা কোনও উৎসাহ দেখায় না। মুখরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত মনমোহন সিং-এর সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারতের জীবনবিমা করপোরেশন (*এলআইসি*)-এর দ্বারস্থ হয়। সরকার যেই ঘোষণা করে যে ভারতের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, *এলআইসি* মারফত *ভেল*-এর শেয়ার কেনা হবে, অমনি ২০১৪-র আগস্ট মাসের শেষে *ভেল*-এর স্টকের মূল্য এক ধাক্কায় ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে মনমোহন সরকার এবং পরবর্তীকালে মোদি সরকার এক ঢিলে দুটি পাখি মারতে সক্ষম হয়। প্রথমত, কল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ সন্দেহজনক কাজে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি করা

হয়। এই সব কেনা-বেচায় যে ''অ্যাকাউন্ট বহির্ভূত'' অর্থের আদানপ্রদান হয়, সেই অর্থ হয়তো নির্বাচনের কাজে ব্যয় করারও সুযোগ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বিমা সংস্থাটি যেহেতু কল্যাণমূলক কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে লগ্নি বাড়াচ্ছে, তাই আজকের আধুনিক বিলগ্নিকরণ পরিভাষায় বলা হচ্ছে যে বিমা সংস্থাটির ''নেট-ওয়ার্থ'' বা নিট-বিত্ত বৃদ্ধি পেল! ফলে আরও একটি সংস্থাকে নিলামে চড়ানোর রাস্তা পাকা হলো বলা যায়। বস্তুত, মোদি সরকার এই আর্থিক বছরেই ভেলে-এর পাশাপাশি *এলআইসি*-র বিলগ্নিকরণ-এর পরিকল্পনাও নিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে *এলআইসি*-র কাছে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত অর্থ নাগরিকদের জন্য কল্যাণকর নানান প্রকল্পে (যেমন রাস্তা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে) লগ্নি হয়। এর ফলে দেশের দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ বাড়ে। যেমন জাতীয় সড়ক বা সেতু ব্যবহারের জন্য আমাদের টোল-কর দিতে হয় না। অথচ বেসরকারি লগ্নির ক্ষেত্রে, যেমন দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বেসরকারি সহায়তায় নির্মিত দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে ভোক্তাদের টোল-কর দিতে হয়। তাই পরিকাঠামোতে জীবনবিমা সংস্থার লগ্নিতে আখেরে লাভ হয় সাধারণ নাগরিকদেরই।

আমাদের দ্বিতীয় কাহিনী হলো কোল ইন্ডিয়া এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন বা *ওএনজিসি*-কে ঘিরে। মনমোহন সরকারের শুরু করা ঘোষণাকে কাজে পরিণত করতে মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেই এই দুটি সংস্থাকে বিলগ্নিকরণের উদ্দেশ্যে পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। এই ঘোষণার পর থেকেই গত সাত-আট মাসে এই দুই সংস্থার স্টকের মূল্য কমছে। বর্তমানে *ওএনজিসি*-র স্টকের দাম তার সর্বোচ্চ দামের ১০ শতাংশের মতো কমে গেছে। স্টকের দাম কমলে বিক্রির মারফত প্রস্তাবিত পরিমাণ অর্থ উসুল করার জন্য সরকারকে অনেক বেশি শেয়ার বিক্রি করতে হবে, যা বেনামে কেনার জন্য রিলায়েন্স সহ অনেক বেসরকারি শক্তি-ব্যবসায়ী সংস্থা মুখিয়ে আছে। রিলায়েন্স-কে সরকার যে ক্রমাগত অন্যান্য অন্যায্য সুবিধে দিচ্ছে তা সুবিদিত। প্রস্তাবিত বিলগ্নীকরণের ধুয়ো তুলে আম্বানিদের আবার নতুন করে কম টাকা লগ্নি করে *ওএনজিসি*-র মতো সুগঠিত এবং আর্থিক দিক থেকে লাভবান সংস্থার বিপুল শেয়ারের মালিক হওয়ার পথ যে মোদি সরকার সুগম করছে তাতে সন্দেহ নেই। বেসরকারি সংস্থাগুলি এই বিপুল লাভজনক সংস্থার মুনাফা নিজেরা আত্মসাৎ করবে, এর কোনো সামাজিক উপযোগিতা থাকবে না। সাধারণ নাগরিকরা দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক লাভ থেকে বঞ্চিত হবেন।

নেশাগ্রস্ত মানুষ যেমন নেশার দ্রব্যর সন্ধানে বাড়িঘর সম্পত্তি বিক্রি করে, ঠিক তেমনি বাজেট ঘাটতি মেটাতে ভারত সরকার বিলগ্নিকরণ ও কর্পোরেটদের ঢালাও সুবিধা দেওয়ার রাস্তা বেছেছে। এই বিলগ্নিকরণের উন্মত্ত দিনগুলিতে যেসব সংস্থা আজও সামাজিক কল্যাণে ক্রিয়াশীল সেগুলির কেন জাতীয়করণ করা হয়েছিল, সেই সত্যটিকে বিস্মৃত করানোর অপচেষ্টাও চলছে। এসব দেখে মনে হয় একটু ''পুরানো কাসুন্দি'' ঘাঁটা জরুরি। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গঠন বা সেগুলি জাতীয়করণ করার একটা উদ্দেশ্য ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজারে উপস্থিত বেসরকারি সংস্থাগুলির বেপরোয়া এবং বেআইনি লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে একটি বিপরীতমুখী শক্তি প্রতিষ্ঠিত করা। (অবশ্য এটাও বলে রাখা ভালো যে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার মতো বিশাল পুঁজি তখন বেসরকারি সংস্থাগুলির ছিল না।) এই উদ্দেশ্য অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সফল হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। রান্নার গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থার উপস্থিতির জন্য সাধারণ মানুষ যতটুকু রিলিফ পেয়ে আসছেন, সেগুলি তাঁরা পেতেন না যদি না এই সমস্ত ক্ষেত্রে *ওএনজিসি*, ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড বা জাতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা *এইচএসপিসি* বা জাতীয় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা *এনটিপিসি*-র মতো সংস্থাগুলি বাজারের দাম নির্ধারণে প্রাধান্য বিস্তারকারী ভূমিকায় উপস্থিত থাকত। আমরা জানি রান্নার জন্য বেসরকারি গ্যাস সিলিন্ডারগুলি কতটা মহার্ঘ, বেসরকারি কয়লা বা বিদ্যুতের দাম কত বেশি। বস্তুত, *ওএনজিসি* এবং কোল ইন্ডিয়া-র শেয়ার বিক্রির পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে রিলায়েন্সকে যে কোনও দামে দেশের বাজারে তেল, গ্যাস এবং কয়লা বিক্রির সুবিধা প্রদান। বলাই বাহুল্য, নানান কৌশলে, বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র সমস্ত কোম্পানি রাতারাতি খুলে তাদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে পেছন থেকে রিলায়েন্স এদের মাধ্যমে কোল ইন্ডিয়া এবং *ওএনজিসি*-র শেয়ার কিনে নিতে বদ্ধপরিকর। রিলায়েন্সকে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার আগেই বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কতগুলি শেয়ার কিনতে পারবে, সেই সংস্থাগুলি সাংগঠনিক রূপ কী হবে, স্টক মার্কেটে শেয়ার নিয়ে হাজির হতে গেলে যে সমস্ত সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারিমূলক আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল, সেগুলিকে সবই একে একে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বস্তুত বর্তমানে যে আইনটি রয়েছে, সেটি বৃটিশ আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রণীত আইনের কার্বন কপি বলা যায়।

এই বিলগ্নিকরণের ফলে আজ যদি শক্তি-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিলতর হয়, তবে রিলায়েন্স-জাতীয় সংস্থাগুলিরই লাভ। আর লাভ হবে যারা পেশীশক্তি আর হাওলার টাকা ছড়িয়ে, খুন-ধর্ষণ-রাহাজানি করে সাংসদ-মন্ত্রী হয়ে দেশদ্রোহী দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো, তাদের। সমূহ ক্ষতি আম-জনতার। কেমন ভাবে? মনে রাখতে হবে, শক্তিক্ষেত্রের এই সমস্ত পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং সংস্থাগুলির মূলধনের

পরিমাণ বিপুল— ফলে যে বা যারা এই সব সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তাদের পক্ষে এই বিপুল মূলধন আত্মসাৎ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এত ধরনের বেসরকারিকরণের আয়োজন, দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, দিনে ডাকাতি— এত কিছু করা সত্ত্বেও শক্তি-ক্ষেত্রের এই সমস্ত *পিএসইউ*-গুলি গত আর্থিক বছরেও ভারত সরকারের অর্থকোষে কেবলমাত্র লভ্যাংশ হিসেবেই ১,৬০,০০০ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে এই সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থা কতটা শক্তিশালী। ঘাটতি দূরে থাক, বিপুল লাভ করছে সংস্থাগুলি। অথচ সেগুলির প্রস্তাবিত বিপুল পরিমাণে শেয়ার বিক্রির এককালীন বিক্রয়জাত অর্থ আসছে মাত্র ৪০,০০০ কোটি টাকা। এত কম দাম, বা পরিভাষায় যাকে বলে 'আন্ডার-বিডিং', এর ফলে 'কাট-মানি'-র পরিমাণ কেবলমাত্র অনুমানই করা সম্ভব।

বিলগ্নিকরণ মারফত যে টাকা সরকারের ঘরে আসার কথা, সেই টাকা খরচ করে সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যই নাকি সম্পত্তি বিক্রির এই আয়োজন। অথচ, কী মনমোহনের আমলে, কী বাজপেয়ীর আমলে, সম্পত্তি বিক্রির এই টাকা জমা হয়েছে সরকারের সাধারণ তহবিলে, বাজেট বহির্ভূত খরচার জন্য। প্রথম ধাক্কার বিলগ্নিকরণে লভ্য অর্থের সিংহভাগ ব্যয়িত হয়েছে ''দেশের যোগাযোগ ও সঞ্চার ব্যবস্থা''-র উন্নতি কল্পে— যা টু-জি স্পেকট্রাম কেলেংকারিতে পর্যবসিত হয়েছে। দ্বিতীয় বৃহৎ অংশ খরচ হয়েছে ''আধার কার্ড'' তৈরি করতে, যার কোনো আইনি, সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক মান্যতা নেই, প্রয়োজনীয়তাও নেই। সন্দেহজনক নানান সংস্থা নানান বরাত পেয়েছে সরকারি টেন্ডার ব্যবস্থা এড়িয়ে গিয়ে। ছবি তোলার বরাত যারা পেয়েছে তাদের এ বিষয়ে দক্ষতা নেই। সাব-কন্ট্রাক্টিং এমন এক জটিল ব্যবস্থা যে কোনও সংস্থাকেই শেষ পর্যন্ত দায়বদ্ধ করা মুসকিল। তাই ৯০ শতাংশ অর্থ ব্যয়ের পর ১ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে— সেই ১ শতাংশের মধ্যে আবার ৪৫ শতাংশ ভুল।

পূর্বতন ইউপিএ-এ সরকারের মতোই মোদি সরকারও বিলগ্নিকরণের ফলে প্রাপ্ত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করবে আধার-কার্ড-এর জন্য, কোনও সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পে নয়। বাকি টাকা ব্যয় করা হবে সরকারি সংস্থা *এনএইচপিসি*-র কয়েকটি জল বিদ্যুৎ প্রকল্পে— যেগুলি আবার *এনএইচপিসি*-র বিলগ্নিকরণের দ্বিতীয় দফার প্যাকেজ হিসেবে ২০১৫-১৬ সালে নিলামে তোলা হবে!

কয়লা বণ্টন নিয়ে কেলেঙ্কারির সুযোগে নতুন নতুন সংস্থাকে অন্যান্য সুবিধে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভারী শিল্প থেকে ঘড়ি নির্মাণের মতো লঘু শিল্প, খাদ্য থেকে বাসস্থান, স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা— সর্বত্র করাল ছায়া বিস্তার করছে বেসরকারিকরণ-বিলগ্নিকরণ নামক ক্ষুধার্ত বাঘিনী। দরবারি বামেরা দরবারচ্যুত হওয়ার ফলে নখদন্তহীন। সশস্ত্র বিপ্লবীরা পাহাড় আর জঙ্গলে। খোলা মাঠে সম্মুখ সমরে ধেয়ে আসছে বিশ্বায়নের ধাবমান রথ। প্রতিরোধের বিশ্বায়ন কি প্রতিক্রিয়ার বিশ্বায়নের রথকে থামাতে পারবে?

সব চরিত্র বাস্তব

পরিচয় কানুনগো

—জমির যদি উচিত দাম না পাই, ও জমি আমরা দেবনা।

—দিবি না মানে? সবাই জমি দিয়েছে, সবাই চেক নিয়েছে, তোরা কয়েকজন কেবল গণ্ডগোল পাকাচ্ছিস।

—আমাদের জমির বাজার দর অনেক বেশি। বাজার দর পেলে জমি ছেড়ে দেব।

—জমির দাম কি আমরা ঠিক করেছি? এ তো বামফ্রন্ট করেছিল।

—বামফ্রন্টের জুতোয় আপনারা পা গলাচ্ছেন কেন? জমির ঠিকঠাক দাম যদি দিতে না পারেন তো, জমি ফেরত দিয়ে দিন।

—আব্দার নাকি? জমি ফেরত দেওয়ার দাবি ভুলে যা। ১০০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট। এটা করতে না পারলে আমাদের সরকারের মুখ পুড়বে।

—একটা কথা বুঝিয়ে বলুন দেখি। সিঙ্গুর আর অন্ডাল, দুটোই ছিল বুদ্ধদেব বাবুর স্বপ্নের প্রকল্প। ওখানে টাটা আর এখানে চাঙ্গি। সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিলেন? এখানে উল্টো কথা বলছেন কেন?

—সিঙ্গুরের নাম নিবি না। কোথায় সিঙ্গুর আর কোথায় অন্ডাল? সিঙ্গুরের মতো তিন ফসলি জমি অন্ডালে আছে, না এখানে দিদি ২৬ দিন অনশন করেছে? তোরা তো দাম পেলেই জমি ছেড়ে দিবি। তোদের সঙ্গে সিঙ্গুরের তুলনা?

—সেচ নেই, জল নেই, তাই এখানকার জমি একফসলি। কিন্তু তা বলে জমির দাম পাবো না? আপনাদের 'সিঙ্গুর আইনেই' তো বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ না নিলেই 'অনিচ্ছুক' হিসাবে গণ্য করা হবে। তা আমরা কী দোষ করলাম? আমরাও তো ক্ষতিপূরণ নিইনি।

—উন্নয়ন বিরোধিতাকে এই সরকার প্রশ্রয় দেবে না।

—এটাকে আপনি উন্নয়ন বলছেন? এই যে ২৩৮৫ একর জমিতে বিমাননগরী হচ্ছে, তাতে কোন্ শিল্পটা হচ্ছে শুনি? পুরোটাই তো প্রোমোটার রাজ চলছে। আমাদের কাঠা পিছু ১২.৫ হাজার টাকা দাম দিয়ে, কাঠা পিছু ৬-৭ লাখ টাকা দরে

জমি বেচাকেনা চলছে। আমাদের খুদকুঁড়ো দিয়ে জমি থেকে ভাগিয়ে হোটেল, মল, বিনোদন পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্গাদার-খেতমজুররা তো সেটুকুও পায়নি। এই বাবুবিলাস করার জন্যই কি বাংলার মানুষ আপনাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছিল? আপনারা বলেছিলেন, জোর করে জমি নেবেন না। কিন্তু নিচ্ছেন। বলেছিলেন, কোন কোম্পানির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবেনা। তাও হচ্ছে।

—এই, এই, আমাদের দুষবি না। অধিগ্রহণ আমরা, মানে মা-মাটি-মানুষের সরকার করেনি। করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। তবে হ্যাঁ, অধিগ্রহণ একবার করা হয়ে গেলে, জমি ফেরত দেওয়ার সংস্থান আইনে নেই। অন্ডালে জমি নেওয়া হয়েছে। এখন যদি তা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা হয়, তা হলে জটিলতা বাড়বে। তা ছাড়া, শিল্পের জন্য জমি তো লাগবেই। না কি বল?

—এ কথা তো ভোটের সময় বলেন নি। এখন ক্ষমতায় এসে ভোল পাল্টে ফেললেন?

—এই প্রজেক্ট থেকে এখন সরে যাওয়ার উপায় নেই। সিঙ্গাপুরে আমরা কথা দিয়ে এসেছি। চাঙ্গি কোম্পানির সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। ওদের নিমন্ত্রণে দলবল নিয়ে সিঙ্গাপুর গেলাম। একটু সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে তো না কি? দিদির তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে, না কি!

—শুরু থেকেই পেটমোটা কোম্পানিগুলোর তোষামোদি করছেন। আজ চাঙ্গিকে তুষ্ট করছেন, কাল টাটাকে করবেন। আজ সিঙ্গুরের মানুষগুলোকে পথে বসিয়েছেন, কাল সারা বাংলাকে পথে বসাবার জোগাড় করছেন। কাটোয়াতে এনটিপিসি কৃষকদের থেকে সরাসরি জমি কিনতে বাধ্য হয়েছে। দিশি কোম্পানির বেলায় যা সম্ভব হলো, বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা হচ্ছে কেন?

—সবসময়ে কি আর ভোটের অঙ্ক চলে রে? সরকার চালাতে গেলে কোটিপতিদের মদত প্রয়োজন। দেশটা তো ওরাই চালাচ্ছে। এসব ব্যাপার তোদের মতো সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকবে না। যা টাকা পেয়েছিস, ব্যাঙ্কে রাখ। সুদ পাবি।

—ঐ কটা টাকা অভাবের সংসার শুষে নেয় বাবু। ওসব ব্যাঙ্ক, সুদ আমাদের জন্য নয়। দেশে ২০১৩ সালে নতুন একটা আইন হয়েছে। সেই আইনে এটুকু অন্তত স্বীকার করা হয়েছে, কোন কোম্পানির হয়ে জমি নেওয়ার আগে অন্তত ৮০ শতাংশ মানুষের সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন। নতুন আইনে ক্ষতিপূরণও অনেক বেশি পাওয়া যেত। জমি কাজে না লাগলে, ফেরত দেওয়ার বিধানও নয়া আইনে রাখা হয়েছে। সারা দেশের মানুষ প্রচণ্ড লড়াই-সংগ্রাম করে এই সুযোগ-সুবিধাটুকু আদায় করতে পেরেছে। আপনারা সেসব কিছুই তো মানছেন না।

—আরে ওসব আইন থাকবে নাকি? দিল্লীতে বিজেপি সরকার এসেছে। সব পাল্টে দেবে। অধিগ্রহণ আইন, শ্রম আইন— সব পাল্টে যাচ্ছে।

—ও আপনারা তাহলে সেই সুযোগটা নিচ্ছেন? বিজেপিকে আটকাবার চেষ্টা করবেন না?

—কে আটকাবে বল? বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল— সবাই তো উদারনীতির ঝান্ডাধারী। এমনকি সিপিএম যে সিপিএম, সেও কর্পোরেট পুঁজির হয়ে ওকালতি করে। জবরদস্তি অধিগ্রহণের পদ্ধতিতে তাদেরও সায় আছে।

—আমাদের ছেলেপুলেরা চাকরি-বাকরি পাবে?

—চাকরি কত হবে, ঠিক জানিনা। চাঙ্গিরা কিছু বলছে না। তবে দারোয়ান, মুটে-মজুর, মিস্ত্রি, জোগানদার, সেলসম্যান— এসব কাজের জন্য তো লোক লাগবেই। তোদের কিছু একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো।

—বুঝে গেছি বাবুমশায়। অন্ডাল আর আমাদের থাকছে না। বাবুদের বাগানবাড়ি হতে চলেছে। ঠিক আছে, আপনারা আপনাদের পথে চলুন, আমরা চলবো আমাদের পথে। মোলাকাত তো একদিন হবেই। দেখবো, সেদিন কে জেতে।

সংলাপ কাল্পনিক, কিন্তু ঘটনাটা বাস্তব। গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৪, অন্ডালে, জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেছিলেন, ''ওই জমি ইতিমধ্যে সরকার অধিগ্রহণ করেছে। সিঙ্গুরে করা হয়েছিল, এখানেও করা হয়েছে। এবং আপনারা জানেন, অধিগ্রহণ এক বার যদি করা হয়, সেই জমি ফেরত দেওয়ার কোনও আইনি সংস্থান নেই।'' কথোপকথনে একপক্ষ জমিহারা কৃষক এবং অপরপক্ষে শাসক দলের কোনো মন্ত্রী বা প্রতিনিধি। সমস্ত তথ্যের উৎস বাজার চলতি দৈনিক পত্রিকা।

ভ্রম সংশোধন

গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় কিছু ভুল ছাপা হয়েছে।

১। পৃ. ১২-য় 'পেটের খিদে যে বড্ড বেয়াড়া মাস্টারমশাই' লেখাটির ৬ নং প্যারার ৬ লাইনে আছে ''সারের ওপর ভ্যাট নেওয়া হয় না''। হবে ''সারের ওপর ভ্যাটের পরিমাণ মোদী শাসিত গুজরাটে ছিল ৫ শতাংশ। দেশের মধ্যে অন্য কোথাও সারের ওপর এত ভ্যাট নেওয়া হয় না।''

২। পৃ. ১২-য় একই লেখার একই প্যারায় (''তবে এটা ঠিক, শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে...'') 'বর্গ কিলোমিটার'-গুলি হবে 'বর্গ মিটার'।

৩। পৃ. ১৩-য় একই লেখার ৯ নং প্যারায় (''এখন উন্নয়নকে মাপতে...) ১৬ লাইনে ''অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে ০.২৫ শতাংশ'' বাদ যাবে।

৪। পৃ. ১৮-য় সব্যসাচী গোস্বামীর কবিতাটিতে শেষ লাইনে আছে ''জেলা-উৎসব'', হবে ''মেলা, উৎসব''।

ফিরে দেখা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ১০০ বছর পর

সহদেব মন্ডল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পৃথিবীর মানচিত্র আজকের তুলনায় নাটকীয়ভাবে ভিন্ন ছিল। এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশই ছিল পদানত, কোনও না কোনও ইউরোপীয় জাতির প্রত্যক্ষ উপনিবেশ। জার্মানি চালাতেন কাইজার, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন সম্রাট। রাশিয়ায় রাজত্ব করতেন জার। আজকের দুনিয়ার অনেক দেশের কোনও অস্তিত্বই ছিল না সেদিনের মানচিত্রে। ১৯১৪ জুন মাসে সারাজেভোতে হাপসবুর্গ বংশের অস্ট্রো-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যের একজন উত্তরাধিকারীর আততায়ীর হাতে মৃত্যুর পর পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলো। যারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, সেই জার, কাইজার ইত্যাদিরা ছিল ক্ষয়িষ্ণু পশ্চাদপদ মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি। তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না। সমাজ বিবর্তনের অনিবার্য তাড়নায় বাজার দখল, মুনাফা, উপনিবেশের ওপর অধিকার কায়েমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল পুঁজিবাদের নিয়মের নিগড়ে বাঁধা সাম্রাজ্যতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববাজারের ওপর প্রভাব-বলয় বিস্তার করা। বস্তুত প্রথম তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণটি ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী (তখন তিনি ফার্স্ট লর্ড অফ অ্যাডমিরালটি) উইনস্টোন চার্চিল কবুল করে বসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-মুহূর্তে তিনি বলেন যে, ব্রিটেনের একটি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তীব্র হিংসা দ্বারা দখল করা উপনিবেশসমূহ এবং যেগুলি টিকে রয়েছে কেবলমাত্র প্রচণ্ড বলপ্রয়োগ মারফত— ব্রিটেনের সেই মৌরুসিপাট্টা এখন অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহ বলপ্রয়োগ করে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছে— অতএব সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই যুদ্ধ অনিবার্য।

বাস্তব ঘটনাবলীর দিকে নজর করলেই চোখে পড়ে যে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক তার সমান্তরালে যুদ্ধবিরোধী শক্তিগুলি, বিশেষত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ছত্রছায়ায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন আসন্ন পুঁজিবাদী বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি চিহ্নিত করে সক্রিয় যুদ্ধ-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু আগেই ক্ষমতার মূল কেন্দ্রগুলি ও তার প্রান্তিক অঞ্চলে, উপনিবেশগুলিতে ইউরোপীয় জাতিগুলি নানান তীব্রতার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ তাদের অস্ত্র সংগ্রহ, অস্ত্র উৎপাদন এবং সেনাবাহিনী খাতে খরচা বৃদ্ধি করে বিপুল পরিমাণে— তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে পৃথিবীজোড়া শ্রমিক আন্দোলন।

১৯০২ সালে সমাজতন্ত্রের সমর্থক, তাত্ত্বিক নেতা রুডনফ্ হিলফেরডিং বলেন যে,

> বিশ্ববাজার দখলের সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির কোনও বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না তা হয়না— পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসী পররাষ্ট্র-নীতির মাধ্যমেই এই সংগ্রাম দৃশ্যমান হবে। ...যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি, নৌবহরের পরিসর বৃদ্ধি, দেশের পর দেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়ার উত্থান, হিংসা এবং অশান্তির আবহাওয়া এক আসন্ন ঝড়ের বার্তা বহন করছে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত স্টুর্ডগার্ট সম্মেলনে বলে—

> উপনিবেশবাদ দাসত্বের জন্ম দেয়, গায়ের জোরে শ্রমিকদের খাটায় এবং উপনিবেশে বসবাসকারী ভূমিপুত্রদের উচ্ছেদ করে। সমাজের ওপর পুঁজিবাদের যে সংস্কারমূলক প্রগতিশীল প্রভাব ছিল, আজকে তা কেবলমাত্র জবরদখল এবং শোষণের বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার এক কৌশলে পর্যবসিত হয়েছে।

১৯১২ সালে রাসেলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে ঘোষণা করা হয়—

> যদি যুদ্ধের হুমকি বজায় থাকে, তবে যে সব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা সরকারে নির্বাচিত হয়েছেন বা সরকারের কোনও না কোনও অংশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের কর্তব্য হবে এই হুমকির সর্বাত্মক বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। যদি যুদ্ধ বাধে, তবে তাঁদের কাজ হবে সেই যুদ্ধ দ্রুত থামিয়ে দেওয়ার জন্য যা যা করা উচিত সেই কাজে লিপ্ত হওয়া— যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটকে ব্যবহার করে জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী শ্রেণীশাসনের অবসান ত্বরান্বিত করা।

কিন্তু আগস্ট ১৯১৪-তে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তার এই অবস্থান থেকে সরে এসে যুদ্ধের পক্ষে, নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের পক্ষ অবলম্বন করে। বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবুর্গ ঘোষণা করেন যে এক অনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মৃত্যু ঘটল।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যতন্ত্রের একটি দুর্বল অংশের প্রতিনিধি রাশিয়ায় একজন প্রায় অচেনা তরুণ বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিচ

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবসান এবং আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের ভেতর এক বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পান। বস্তুত তাঁর কড়া যুদ্ধ বিরোধিতা এবং শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার ধারণা রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির ভিত শক্ত করে এবং পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক-রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করে। যখন জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আহ্বান পরিত্যাগ করে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'মহান পিতৃভূমির সার্বভৌমত্ব' রক্ষার পবিত্র কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছে, ঠিক তখনই লেনিন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই পতনের কারণ ইউরোপের দেশগুলোর শ্রমিক নেতাদের জীবন ও জীবনীর মধ্যে খুঁজলেই চলবে না। তাঁর মতে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন একটি পুরো যুগের সমাপ্তির সূচক এবং সেই বিগত যুগটি হলো সুস্থিত এবং শান্ত পুঁজিবাদ বিকাশের যুগ। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সেই চাঞ্চল্যকর যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৃদ্ধি পেয়েছিল— তার যুগান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকও শেষ হয়ে গেছে। এখন জন্ম হচ্ছে এক নতুন যুগের—যা যুদ্ধ এবং বিপ্লবের যুগ। ভ্লাদিমির বুঝেছিলেন যে, এই নতুন যুগে যুদ্ধ শুরু হলে বিপ্লবও আরও দূরবর্তী কোনও স্বপ্ন হয়ে থাকবে না— যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এই বিপ্লবের আগমনকে ত্বরান্বিত করবে সেগুলির জন্য সচেতন প্রস্তুতির সময় আগত। তাই বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের মধ্যে থেকে শ্লোগান ওঠে— এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করো! এই লক্ষ্যেই শ্লোগান ওঠে— সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই। তাই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রুশ বিপ্লব ঘটলে যুদ্ধরত বিপরীত শিবিরের জার ও কাইজার পরস্পরের সঙ্গে শান্তি ও সন্ধি চুক্তি করে যুগ্মভাবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক শতাব্দী কেটে যাওয়ার পর আমরা আবার দেখছি পৃথিবীর মানচিত্রে নাটকীয় পরিবর্তন। সোভিয়েত রাশিয়া অবলুপ্ত, পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত, সারাজেভো আগের মতোই রক্ত-লাঞ্ছিত। ইউরোপ জুড়ে জাতি-দাঙ্গা। কর্মহীন, বুভুক্ষু শ্রমিকদের দল রুটি-রুজির জন্য সংগ্রাম করছেন। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইউক্রেন প্যালেস্টাইন জুড়ে। দেশে দেশে ছোটখাটো সীমান্ত সংঘর্ষ নিত্যদিনের ঘটনা।

দুঃখের বিষয়, লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমকে সংহত করে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে আমূল সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলো, কিন্তু আজকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একশো বছর পরে আবারও দেশে দেশে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ বামপন্থী পার্টিগুলি বুর্জোয়াদের বা বুর্জোয়াদের লেজুড়দের লেজুড়বৃত্তি করছে। বলছে সাম্রাজ্যবাজী বিশ্বায়নের কোনও বিকল্প নেই— তাই পুঁজিবাদের পায়েই আত্মসমর্পণ করে আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে থাকুক।

কিন্তু পুঁজিবাদীদের মধ্যে সংঘাত যত বাড়ে, যুদ্ধের সম্ভাবনাও বাড়ে— বাড়ে বিপ্লবের সম্ভাবনাও। অপেক্ষা সেই কম্বুকণ্ঠে আহ্বানের— "দেখা হবে রণক্ষেত্রে অসিতে অসিতে"।

একটি গণহত্যার তিরিশ বছর

তড়িৎ চৌধুরি

"একটি বড় গাছ যখন মাটিতে পড়ে তখন পৃথিবী তো কাঁপবেই"— রাজীব গান্ধী বলেছিলেন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ১৯৮৪ সালে দিল্লী-সহ সারা ভারতে শিখ-নিধন যজ্ঞে ৭০০০-এর বেশি শিখ নিহত হবার পর। স্বাধীনতা-উত্তর এই সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে কেন্দ্রে বা রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অমানবিক হিংস্র মুখ বারবারই দেখা গেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গেই ১৯৭১ কাশীপুর-বরাহনগর নকশাল গণহত্যা, ১৯৭৯ সালে সদ্য বাম জমানার শুরুতেই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যা। বিচারব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এই সব গণহত্যার বিচার বা সুবিচার হয়নি। কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছে এককে সরকারের আমলে, যেমনটি এবার কেন্দ্রে নতুন সরকার গণহত্যার শিকার শিখদের প্রতি পরিবারকে ৩ লাখের বদলে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। কিন্তু মূল দোষীরা তো মুক্ত! আর পশ্চিমবঙ্গের দুটি গণহত্যার তো কোন বিচার শুরুই হয় নি আগে! যদিও নন্দীগ্রামের রাষ্ট্রীয়-শাসকদলের মিলিত হত্যাকাণ্ড এখন বিচারের বিষয়ের আওতায় এসেছে বলা যায়।

কিন্তু এই দেশে অন্য সব গণহত্যার সাথে '৮৪ সালের শিখ-গণহত্যার একটি মৌলিক তফাত আছে। ঐ হত্যাকাণ্ডের শুরু ৩১ অক্টোবর, যেদিন সকাল বেলায় তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁরই দুই দেহরক্ষী গুলি করে হত্যা করেছিল। সেইদিনই বিকাল বেলায় দিল্লী থেকে শুরু হয় শিখ নিধন যজ্ঞ! দুজন দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং-এর হাতে ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু যে শিখ বিরোধী দাঙ্গার আগুন ছড়ায় তার পিছনে শুধুই আবেগ ছিল না। ছিল এদেশে পরিবারতন্ত্র পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় করার একটি প্রয়াস।

অন্যান্য দাঙ্গা বা গণহত্যার পেছনে যেমন বর্ণ, জাত, ধর্ম

কাজ করে, বা বলা যায় বর্ণ-জাত-ধর্মকে কাজে লাগানো হয় উচ্চবর্গের হাতে শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য, তেমন কোনো কারণ কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর হত্যার পেছনে ছিল না। কেননা ঐ সময় একদলীয় শাসনব্যবস্থা নয়, ভারতের 'লৌহমানবী' চেয়েছিলেন গণতন্ত্রের বদলে সব রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। সেই '৭০ দশকের প্রথম পর্ব থেকেই প্রধানমন্ত্রী গান্ধী যেনতেনপ্রকারেণ সব ক্ষমতার প্রতিভূ হতে চেয়েছিলেন। ফলে যেমন নিজের দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দমন করতে মূলত হাজার হাজার যুব ছাত্র যারা সংসদীয় লড়াই ছেড়ে সমাজ বদলের দিশা খুঁজছিল তাদের হত্যা করা হয়েছিল, আবার একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করা হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে দুর্নীতির দায়ে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন বাতিল হলে তিনি হাইকোর্টের রায় না মেনে সব চলতি ব্যবস্থাকে পদানত করতে ১৯৭৫ সালে 'এমারজেন্সি' জারি করেন। এই সময় সমস্ত বিরোধী নেতা-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাংবাদিকদের জেলে ঢোকানো হয়েছিল, তেমনই কংগ্রেস দলের সমর্থক অকালী দলের বহু সদস্য শিখদেরও গরাদের ভেতর রাখা হয়। ফলস্বরূপ ১৯৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী জনগণের হাওয়ায় কংগ্রেস গেল উড়ে।

কিন্তু সারা ভারত জুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সহনীয় করে তুলতে দরকার একটি শক্ত দলীয় সংগঠন, যেটা দিতে পারে জাতীয় কংগ্রেস অর্থাৎ 'ইন্দিরা গান্ধী'। ফলে, বিপুল শক্তিতে ইন্দিরার প্রত্যাবর্তন। এবার তিনি সব রাজ্যেই নিজের পছন্দসই লোককে মুখ্যমন্ত্রীত্বে বসালেন। একই সাথে পঞ্জাবে অকালী দল বা নিজের দলের মধ্যে বিরোধিতাহীন করার জন্য 'আনন্দপুর সাহিব' প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরেই শিখরা স্বায়ত্বশাসন সহ নানা সুবিধাসহ একটি আলাদা রাজ্যের দাবি করছিলেন। কিন্তু এ কথা শুনলে তো অনেকের কথাই শুনতে হয়। কাশ্মীরে কাশ্মীরীদের কথা, নাগা-মিজোদের কথা বা তেলেঙ্গানা রাজ্যের কথা শুনতে গেলে তো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা চলে না। তাই ভিন্দ্রানওয়ালকে উচ্ছেদের পরিকল্পনা। শিখদের ধর্মীয় পীঠস্থান স্বর্ণমন্দির থেকে সশস্ত্র খালিস্থানপন্থী ভিন্দ্রানওয়ালকে উচ্ছেদ করতে সামরিক বাহিনীর অভিযান। একই সাথে হেলিকপ্টার ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণ। ১৯৮৪ সালের জুন মাসের মধ্যে পঞ্জাবকে বিরোধী শূন্য করা গেল। যদিও অপারেশন ব্লুস্টার-এর ফলে 'অকাল তখত' ধ্বংস হল, নিহত হল প্রায় এক হাজার, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন "ধর্মভীরু শিখ পুরুষ মহিলাদের দল।"

এই অপারেশন কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীকে গণতন্ত্র-বিমুখ স্বেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্রী হিসাবেই তুলে ধরেছিল। ফলস্বরূপ ঐ স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাধরকে শেষ করতে হবে, এটাই ছিল শিখদের বিবেকের নির্দেশ।

১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী হত্যার খবর প্রচারিত হতেই পশ্চিমবঙ্গে সফররত রাজীব গান্ধী দ্রুত দিল্লী ফিরে আসেন এবং তখনই জগদীশ টাইটলার, সজ্জন কুমার, আর কে ধাওয়ান, এইচ কে এল ভগৎ-এর মতন কংগ্রেসী নেতারা মিলে গণহত্যার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে।

১ নভেম্বর থেকে ৩ নভেম্বরের মধ্যে দিল্লীতে হত্যা করা হয় ৪০০০ জন শিখকে, যার মধ্যে ৫০ জন ছিলেন সেনাবাহিনীর আধিকারিক। দিল্লী শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় ২০,০০০ মানুষ। সারা দেশের বিভিন্ন জায়গা ধরলে নিহতের সংখ্যা সংখ্যা প্রায় ৭০০০। সবচেয়ে বেশি বর্বর আক্রমণ চলে দিল্লীর ত্রিলোকপুরী, সুলতানপুরী, সেনাপুরী ও কল্যাণপুরীতে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সহায়তায় ভোটার লিস্ট ধরে ধরে শিখ বাসিন্দাদের প্রতিটি বাড়ি খুঁজে বার করে তাদের জীবন্ত পোড়ানো হয়েছিল।

এরাজ্যে পরিবর্তনের পর পরিবর্তনপন্থী নাট্যকার-কবি-শিল্পীরা তো কথায় কথায় সোভিয়েত রাশিয়ায় অত্যাচারের গল্প করেন, নাটক করেন। তারা জরুরি অবস্থার কথা ভুলে যান কেন, কেনই বা ভুলে যান শিখ গণহত্যার কথা, যা একটি সরকারি শাসক দল পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তায় ঘটিয়েছিল?

দশটি তদন্ত কমিশন বসেছিল দোষীদের চিহ্নিত করতে, নিহতদের সংখ্যা সঠিক নির্ধারণ করতে, দিল্লী পুলিশের ক্ষমতা খতিয়ে দেখতে। এ একটা রেকর্ড! তবু দিল্লী পুলিশ ৬৫০টি এফআইআর করেছিল, ৩৬৩টি চার্জশীট ফাইল হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল ৪৪২ জন, তার মধ্যে ৪৯ জনের আজীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। এবং নিয়মমাফিক, রাজীব গান্ধী সহ কংগ্রেসী নেতারা কেউই বিচারের অলিন্দে ঢোকেন নি, যদিও এফআইআর-এ নাম ছিল সবারই।

আমরা কি পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনের সাথে তিরিশ বছরের আগের ঐ ঘটনার কোন মিল খুঁজে দেখব! শাসনক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কি গণতন্ত্রকে অচিরেই ধ্বংস করে না, যেমনটি হয়েছিল তিরিশ বছর আগে?

ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে অবস্থিত ইউনাইটেড নেশন্‌স হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইট্‌সের কাছে শিখ ফর জাস্টিস (হিউম্যান রাইট্‌স্ গ্রুপ) ১৯৮৪ সালের গণহত্যার প্রকৃত বিচার চেয়ে আন্দোলন করছেন। বাংলাদেশে তো ১৯৭১ সালের ৪৩ বছর পর গণহত্যার আসামীদের বিচার ও শাস্তি শুরু হয়েছে জনতার চাপে। দেখা যাক, এক্ষেত্রে ইতিহাস কোন্ দিকে এগোয়?

প্রবন্ধ

#হোক কলরব

অরিজিৎ

রংচটা দেওয়াল মুহূর্তের আঁচড়ে ক্যানভাস হয়ে ওঠে, দৃশ্যপটে খেলা করে বিদ্রোহের স্থিরচিত্র। অচেতনে লালিত হওয়া বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। যে বাসনা তিন দশকের শীতঘুম শেষে বসন্তের ছোঁয়া পেয়েছিল অত্যাচারের অস্বস্তিকর দাবদাহে দগ্ধ সে বাসনা হয়তো একটা বোধ তৈরি করছিল অজান্তে। শাসকের চোখরাঙানি যেমন ভয়ের জন্ম দেয়, পাশাপাশি জন্ম দেয় স্পর্ধারও। মাঝশরতের প্লাবন তাই ভাসিয়ে দিল মহনগরীর রাজপথ। নাছোড়বান্দা বৃষ্টি, যেন আরো নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েগুলো। সম্মিলিত প্রাণের স্পন্দনে মিছিল হয়ে উঠেছে মহা(ন)। উৎসব শেষের হিমেল হাওয়া সেই মিছিলেরই হাতে তুলে দিয়েছে মশাল। মহামিছিল হয়ে ওঠে মহাকাব্য, শহরতলি, মফস্বল, শহরের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আসা ফুলগুলো সব শব্দ হয়ে ভিড় বাড়ায় সেই কাব্যের পাতায়। বিদ্রোহের বিদেহী সংবিৎ মূর্ত হয়, ফিরে আসে।

ঘটনার সূত্রপাত ২৮ আগস্ট, ২০১৪-র রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আর্টস ফ্যাকাল্টির *সংস্কৃতি* চলাকালীন এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে। অভিযোগের তীর ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরস্থিত নিউ পিজি হস্টেলের কিছু ছাত্রের দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আন্দোলনের ঐতিহ্য হিসেবে, প্রগতিশীল চর্চার জায়গা হিসেবে, এমনকি লিঙ্গবৈষম্য সংক্রান্ত বিষয়ে চর্চার বাতাবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে থাকলেও গোটা সমাজ জুড়ে যে পুরুষতন্ত্রের আস্ফালন তা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ জীবনচর্যাও মুক্ত নয়, কেবল বিপরীত স্রোতটা গোটা সমাজের গড়ের তুলনায় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে বেশি— এটুকুই বলা যায়। ঘটনার দু-দিন পর নিগৃহীতা মেয়েটি ভিসি-র কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি মেয়েটিকে ঘটনাটি চেপে যেতে বলেন। সমাজে এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলার সাথে সাথে বিভিন্ন সরকার, কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনের তরফ থেকে এ ঘটনাগুলোকে তুচ্ছ ঘটনা হিসেবে দেখা এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই দুষ্কৃতীদের মদত দেওয়ার যে নজির আমরা দেখেছি অতীতের দিল্লী কিংবা কামদুনি, গেদে বা পার্কস্ট্রীট কাণ্ডকে কেন্দ্র করে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কার্যত তার ব্যতিক্রম কিছু পাওয়া গেল না।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ যাদবপুর থানায় লিখিতভাবে জমা পড়ে মেয়েটির তরফ থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে স্বাভাবিক নিয়মেই *আইসিসি*-র (ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি) ওপর তদন্তের ভার পড়ে। খবরটি জনসমক্ষে এলে এবং ভিসি-র উদাসীন মনোভাবের বিরুদ্ধে কলাবিভাগের কিছু ছাত্রছাত্রীর উদ্যোগে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সাধারণ সভা (*জিবি*) হয় ২রা সেপ্টেম্বর। দাবি ওঠে, *আইসিসি*-র পাশাপাশি বিশাখা গাইড লাইন অনুযায়ী একটা তদন্ত কমিটি বানানোর, যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত হয়। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবীও ওঠে। ডিন অফ স্টুডেন্টস এবং যাদবপুর থানায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু এই দাবিগুলোকে আমল না দিয়ে ক্যাম্পাসে নজরদারি বাড়ানোর জন্য সিসিটিভি আর গেটগুলোতে আইডেন্টিটি কার্ড দেখানোর নিয়ম চালু করা নিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন চেতনার ওপর নজরদারির মাধ্যমে ভয়ের শাসন জারির পুরনো প্রচেষ্টা যা ছাত্রছাত্রীরা আগেও রুখে দিয়েছে— এ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষ সেই পুরনো পথেই হাঁটতে চায়। ইতিমধ্যে *আইসিসি*-র তরফ থেকে দুজন শিক্ষিকা, ঐশিকা চক্রবর্তী এবং সর্বাণী গাঙ্গুলী, ৩ তারিখ মেয়েটির বাড়ি যান এবং স্রেফ কিছু অপ্রয়োজনীয় অপ্রীতিকর প্রশ্ন (যেমন মেয়েটি সে রাতে মদ খেয়েছিল কিনা, কী ধরনের পোশাক পরেছিল ইত্যাদি) করে মেয়েটির অস্বস্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছিল— এই মর্মেই মেয়েটির বাবা পরদিন বিধাননগর থানায় অভিযোগ জানান। ৫ তারিখ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন সংগঠন *ডিএসএফ*-এর পক্ষ থেকে নজরদারি সংক্রান্ত এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৫ তারিখ উপরোক্ত ডেপুটেশনের সময়ই *আইসিসি*-র মিটিং চলছিল। বাইরে চলছিল ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান বিক্ষোভ— দাবি *আইসিসি* থেকে এই দুই শিক্ষিকার অপসারণ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এঁদের পক্ষ অবলম্বন করতে থাকে— তাঁরা নাকি মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। ঐ অবস্থান-বিক্ষোভে 'শিক্ষাবন্ধু সমিতি'-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের তৃণমূলপন্থী সংগঠন, বলা ভালো যাদবপুরের আরাবুলরা) কিছু কর্মী এবং *টিএমসি*-র কিছু সদস্য ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হাতাহাতি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের সাথে। উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে তখন থেকেই। নিরপেক্ষ তদন্ত চাওয়ার ন্যায্য দাবি থেকে, আইনমাফিক কমিটি তৈরির দাবি আর নজরদারির মাধ্যমে দমনপীড়ন বন্ধের আন্দোলনের হাত ধরে সরকারি দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে পরিস্থিতি পেকে উঠতে শুরু করল— অল্প কিছু ছাত্রছাত্রীর আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকল আরো নানান অংশের ছাত্রছাত্রীরা এবং সংগঠনগুলো।

১০ সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনিক দপ্তর অরবিন্দ ভবনের গাড়িবারান্দায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান শুরু হয়। দাবিগুলো সেই একই, কিছু 'তুচ্ছ' আর ন্যায়সঙ্গত দাবি। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বিরুদ্ধে, অন্যায়ভাবে চলা *আইসিসি*-র পুনর্নির্মাণ আর ন্যায়সঙ্গতভাবে তদন্ত কমিটি তৈরি, বিশাখা গাইডলাইনে যেভাবে বলা হয়েছে— সেইসব দাবি, যেগুলো দাবি আকারে পেশ করার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করে ফেলা উচিত ছিল।

এরপর ক্যাম্পাস গণতন্ত্রের সেই কলঙ্কময় দিন। ১৫ সেপ্টেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ সংস্থা *ইসি*-র মিটিং। *ফেটসু*, (ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীদের ইউনিয়ন) সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য কিছু ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে *ইসি*-তে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং বাইরে অবস্থান চলে। কিন্তু তদন্ত কমিটি, নিরপেক্ষ তদন্ত নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে *ইসি*-তে ক্যাম্পাসে নজরদারি, সিসিটিভি বসানো ইত্যাদি নিয়েই আলোচনা চলে। বিকেল ৪টের সময় ডেপুটেশনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মিটিং-এর একটা মিনিট্স আসে এই মর্মে যে *আইসিসি*-র কাছে ঐ শিক্ষিকার নামে কোনো অভিযোগ আসেনি, এলে ভেবে দেখা যাবে, এবং ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী ৯০ দিনের মাথায় কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে। তখনও অবধি অবস্থানে তিনটি ফ্যাকাল্টির তিনটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ঘোষিতভাবে উপস্থিত ছিল না। আন্দোলনের গতিপথ অবস্থান থেকে *ইসি* ঘেরাও-এ পরিবর্তিত হল। দাবি উঠল, কমিটি পুনর্গঠনের ব্যাপারে ভিসি-কে ছাত্রছাত্রীদের সামনে এসে কথা বলতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভিসি মন্তব্য করেন, ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলতে তাঁর নাকি আত্মসম্মানে বাধে। একটা বিশ্ববিদ্যালয় যাদের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ যারা, প্রকৃত অর্থেই যাদের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়ে পাঁচতারার সম্মান তাদের প্রতি এ ব্যবহারে তারা যে খুশি মনে বাড়ি চলে যাবে না এটাই স্বাভাবিক। ছাত্রসমাজ যে রক্ত আর মাংসে গড়া কিছু যন্ত্র নয়, যন্ত্রবিদ উপাচার্য তা উপলব্ধিই করতে পারেন নি। তার শিরায়-ধমনীতে যে অধিকার সচেতনতা আর প্রতিরোধস্পৃহা সঞ্জাত আবেগের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তা ঠাওর করতে দেরি করে ফেলেছিলেন। সন্ধ্যা ৭টার পর শিক্ষাবন্ধু কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে এলাকার তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী আর *টিএমসিপি*-র সদস্যরা আবার ছাত্রছাত্রীদের চোখ রাঙায় এবং ধস্তাধস্তি শুরু করে। সম্মিলিত ছাত্রশক্তি তখনকার মতো তা প্রতিরোধ করে। সাবজেক্টিভিটির বাইরে আন্দোলনের নতুন অবজেকটিভ কন্ডিশন জন্ম নেয়, যার ওপর দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে যথাবিহিত ঘোষণা মারফৎ *ফেটসু* ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগদান করে আর *এসএফআই* পরিচালিত *এএফএসইউ* ঘেরাওয়ের বিরোধিতা করে অরবিন্দভবন ত্যাগ করে। আন্দোলনের শক্তি কারা তা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক ভরাডুবির সময়ও স্রেফ ফায়দার সমীকরণ নিয়ে ব্যস্ত *সিপিএম*-এর ছাত্র-সংগঠনটি।

রাত ৮টায় ২ গাড়ি *এসটিএফ* সহ মোট ৯ গাড়ি পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং গেটের বাইরে যাদবপুর স্টেশনমুখী রাস্তায় এসে জমা হয়; বাতাসে ত্রাসের গন্ধ বাড়তে শুরু করে। ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকতে শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্তৃপক্ষের আহ্বান ছাড়া কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এহেন রাষ্ট্রীয় জল্লাদদের প্রবেশের কোনো আইন নেই। সে রাত্রে পুলিশ পিটিয়ে যাওয়ার পর ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে পাঠানো আর পুলিশ আটকানো নিয়ে অতীত ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে বিস্তর। অতীত আন্দোলনের সাথী, বিদ্বজ্জনদের কথায় যেমন উঠে এসেছে ত্রিগুণা সেনের কমিউনিস্ট ছাত্রকে খুঁজতে আসা পুলিশকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে না দেওয়ার কাহিনী, তেমনই জরুরি অবস্থায় মিলিটারির অত্যাচার কিংবা '৭৮-এর বামফ্রন্ট জমানার উষালগ্নেই ছাত্র বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ হামলার ঘটনা। ২০০৫-র স্মৃতি তো এখনো দগদগে। ১০ জুনের সে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউ কেউ এ রাতেও উপস্থিত ছিল। ২০১০-র গান্ধীভবন উদ্বোধনের সময় বুদ্ধ সরকারের পুলিশ ক্যাম্পাসে যে ছাত্রছাত্রীদের নির্মমভাবে লাঠিপেটা করেছিল তাদের অনেকেই এ আন্দোলনের সামনের সারির সংগঠক।

রাত সাড়ে ৮টায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠন *জুটা* আন্দোলনের মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পৌনে ৯টায় ভিসি জানান ৯টা মধ্যে ঘেরাও তুলে নিতে; ৯টার সময় দুজন পুলিশ অফিসার অরবিন্দ ভবনে ঢোকে কথা বলতে। সময় গড়াতে থাকে, ক্যাম্পাসে এদিক ওদিক পুলিশি টহল বাড়তে থাকে। নানান দিক থেকে উড়ো খবর আসতে থাকে বাইরে থেকে শাসকদলের বাহিনী আক্রমণ করতে পারে। রাত সওয়া ১টায় *জুটা*-র একটি প্রতিনিধি দল আবার ভিসি-র সাথে কথা বলতে যায়। ১টা ৫০-এ তাঁরা বেরিয়ে এসে জানান ভিসি জানিয়েছেন যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলতে রাজি নন; ১০ মিনিটের মধ্যে চত্বর ফাঁকা করে দিতে হবে, না হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থাই নিলেন বটে। জঙ্গি দমনে পাঠানো হয় এমন বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হল ছাত্রছাত্রীদের ওপর; সেই বাহিনী যাকে ডাকা হয় চূড়ান্ত শারীরিক বলপ্রয়োগের দরকারে। যে বাহিনীর প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষা দেওয়া হয় জীবন থেকে সংবেদনশীলতা শব্দটি মুছে ফেলার। সাধারণ পুলিশ যে পরিস্থিতি সামলাতে অক্ষম, সাধারণভাবে জঙ্গি দমন বা দাঙ্গা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যে বাহিনী ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন

উঠেছে *এনএসজি*-র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজকুমার সিংহ-র ব্যাপারে। ব্ল্যাক ক্যাট, যাদের মুম্বাই-এর তাজ হোটেলে জঙ্গি দমনে ব্যবহার করা হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলনে এমন বাহিনীর প্রয়োগ ভারতে এই প্রথম। রাত ২টা নাগাদ ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাতে ধরে রাখা ব্যারিকেডের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানে তারা। এক একজনকে ধরে আক্ষরিক অর্থেই শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকে। সে ঘটনার বর্ণনার পরিসর এখানে নেই, টিভি-র পর্দায় সে চিত্র দেখেছেনও সকলে। ভিসি সহ বাকি *ইসি* সদস্যদের বের করে নিয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় আসল তাণ্ডব। সমস্ত আলো বন্ধ করে দিয়ে অন্ধকারে ছাত্রছাত্রীদের পেটাতে শুরু করে; লোক দেখানো হাতে গোনা দু-চারজন মহিলা পুলিশ রেখে পুরুষ পুলিশরাই বিশেযত ছাত্রীদের ওপর চড়াও হয়। সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ ছাত্রছাত্রীদের ওপর সবচেয়ে সংবেদনহীন অংশের রাষ্ট্রীয় মদতে নিপীড়নের চিত্র সেদিন দেখেছিলাম আমরা। স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক নিগ্রহের থেকেও ভয়ানক ট্রমায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ছাত্রছাত্রীরা। ৩৭জন গ্রেপ্তার, ১২ জন হাসপাতালে ভর্তি, তার মধ্যে দুজন ভয়ানকভাবে আহত, এর বাইরে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভালোরকমই আহত।

রাত ৩টের সময়ে ছাত্রছাত্রীরা থানার সামনে রাস্তা আটক করে অবস্থান শুরু করে। সোস্যাল নেটওয়ার্ক মারফৎ সে খবর ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। হস্টেলের অবশিষ্ট ছাত্ররা, এলাকার বিভিন্ন মেসে থাকা ছাত্ররা আসতে শুরু করে। সকাল ৫টায় থানা থেকে জানানো হয়, গ্রেপ্তার হওয়া ৩৭জনকে দাঙ্গা, সরকারি কাজে বাধাদান আর সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা সংক্রান্ত তিনটে ধারায় কেস দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের লালবাজার পাঠানো হচ্ছে। তাদের জন্য উকিল ঠিক করার কথাও জানায় থানা থেকে। পরদিন সকালে ছাত্রীরা পুলিশের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগে *জিডি* এবং *এফআইআর* করে থানায়।

পরদিন, অর্থাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বর। ছুটির দিন, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা একে একে আসতে থাকে ক্যাম্পাসে। বর্তমান, প্রাক্তনী, বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের কর্মী, বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আসতে থাকে যাদবপুরে। একদমই ভেতরের তাড়নায়, পুলিশী বর্বরতাকে ধিক্কার জানাতে আর আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। শ্লীলতাহানির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি থেকে আন্দোলন প্রশস্ত হয়। কর্তৃপক্ষের আধিপত্য, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন আর শাসকদলের চোখরাঙানিকে চ্যালেঞ্জ করার অভিমুখে ঘুরে যায়। বিষয়টা আর শুধু একটা ক্যাম্পাসের বিষয় থাকে না। বিষয়টা অধিকারের, বিষয়টা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের, বিষয়টা দলতন্ত্রের, এককথায় সামাজিক ইস্যু হয়ে ওঠে। পূর্বতন সরকারের পেটোয়া ছাত্রসংগঠন নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়ে আবার সেদিন নির্লজ্জের মতো ময়দানে অবতীর্ণ হয়। বিকেল ৪টেয় মিছিলের পরিকল্পনা হয় এবং ছুটির দিনে কয়েক ঘণ্টার আহ্বানে প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর মিছিল হয়। আঘাতের দগদগে স্মৃতি নিয়ে স্লোগানে আর শারীরিক অভিব্যক্তিতে পুলিশের প্রতি ঘৃণা নিক্ষেপ করেছিল ছাত্রছাত্রীরা যাদবপুর থানার সামনে।

১৮ তারিখ। বিপুল পরিমাণে ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করে ক্যাম্পাসে। বিশেযভাবে বিভিন্ন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছেলেমেয়েরা দলে দলে আসতে থাকে। ওদিকে কলেজস্ট্রিট থেকে মৌলালি পর্যন্ত একটা মিছিল হয়। ক্যাম্পাসের মধ্যে কয়েকটি মিছিল হলেও বিকেলে আবার একটি বড় মিছিল হয় ক্যাম্পাস থেকে আনোয়ার শাহ মোড় হয়ে আবার ক্যাম্পাস। অংশগ্রহণকারী প্রায় ৮ হাজার। কার্যত সেটা আর মিছিল থাকেনি, রাস্তায় ছিল ছাত্রছাত্রীর ঢল। ফেসবুকের হ্যাসট্যাগ *হোক কলরব* বুকের জ্বালাগুলোকে ঝাঁট দিয়ে একত্রিত করতে থাকে যাদবপুর প্রাঙ্গণে। শিবপুরে যেমন ক্যাম্পাসে স্বাধীন মতামত প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, নজরদারি বাড়িয়ে ক্যাম্পাস গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার মডেল ইন্সটিটিউশনে পরিণত করা হয়েছে নয়াউদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে, তেমনই সাধারণ ছাত্রছাত্রী নিজের মত প্রকাশ করার অধিকারের মডেল হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। 'হোক কলরব' শব্দবন্ধটি সকলের মত প্রকাশের অধিকারের অর্থ নিয়ে রাজনৈতিক শিরোনামে পরিণত হল অচিরেই ।

২০ তারিখের নন্দন থেকে রাজভবন অভিযানের মহামিছিলের আহ্বান ফেসবুকে ভাইরাল হতে শুরু করেছে। ১৯ তারিখ কলেজ স্ট্রিটে একটি পথসভা, *এপিডিআর*-এর একটি মিছিল আর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লাল-বাজার অভিযানেও অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। অবশেযে সেই ঐতিহাসিক দিন। ২০শে সেপ্টেম্বর। মহামিছিল। প্রবল বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পা মেলালো সেদিন। বস্তুতপক্ষে পড়ুয়ারা সেদিন দখল নিল রাজপথের। লাইন করে মিছিল করা সম্ভবই ছিল না, মানুযের ঢল সেদিন প্রতিবাদের নতুন সমীকরণ তৈরি করল। মিছিল যখন মেয়ো রোডের শেষ প্রান্তে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে ভাঙতে গিয়ে শেযমেয থমকিয়েছে, নন্দন থেকে তখনও হাঁটা শুরু করছে অনেকে। গানে-স্লোগানে স্বতঃস্ফূর্ত সেই মিছিলের ছবি টিভিতে দেখে তার পরেও এসেছেন বহু মানুষ। বৃষ্টি যেন প্রতিরোধের আগুনকে দারুণ প্রতিশোধে দ্বিগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কলেজ ইউনিভার্সিটির ক্লাস বন্ধ রেখে, প্রাইভেট কলেজের বিধিনিযেধের ঘেরাটোপ এড়িয়ে, কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, শাসকদলের কুক্ষিগত ইউনিয়নের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে

অগণিত ছাত্রছাত্রী মিছিলে পা মেলালো, নতুন নতুন বয়ান তৈরি করে স্লোগান তুলল। প্রতিবাদী গান গাইল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাটক করল— স্বতঃস্ফূর্ততার যে নিদর্শন তারা তৈরী করল তা এককথায় রচনা করল তত্ত্ব আর বাস্তবের যোগসূত্র। খোঁজার চেষ্টা করছিলাম এই বিরুদ্ধতার ভিড় জমানো ছাত্রযুবরা কারা? কেন তারা আন্দোলিত হচ্ছে? যারা সেদিন পা মেলালো তাদের বেশিরভাগটাই একা আসেনি। কোনো না কোনভাবে তারা সংগঠিত— গানের দল, নাটকের দল, পত্রিকা, নিদেনপক্ষে ফেসবুকে গ্রুপ চালায় কিংবা একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে। পরস্পর আলোচনা করে দল বেঁধে চলে এসেছে মিছিলে। সংগঠিত না হলেও সংগঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে তাদের আছে তা স্পষ্ট। এই অংশটা আমাদের দেশে নয়াউদারনীতি প্রণয়নের পর তৈরি হওয়া প্রথম প্রজন্ম বললে অত্যুক্তি করা হবে না। যেভাবে পুরনো দৃষ্টিভঙ্গিকে ছুঁড়ে ফেলে শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে বদলে বিশ্ববাজারের জন্য সস্তায় দক্ষ শ্রমিক যোগান দেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট লাগু হয়েছে তার জন্য সিলেবাস থেকে পরীক্ষাব্যবস্থা, ক্যাম্পাস গণতন্ত্র থেকে শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি সবকিছুতে চলছে আমূল বদল, যাতে করে নতুন ধরনের শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, মনন সম্পূর্ণরূপেই সমাজ-বিচ্ছিন্ন ও উৎপাদনকেন্দ্রিক হয়। সবাইকে প্রতিযোগী ভাবা আর একা বাঁচতে শেখা। এহেন নীতিতে গড়ে তোলা ছাত্রসমাজের কাছে তার কলেজ, হস্টেলের স্বাধীন মতপ্রকাশের স্পেস সঙ্কুচিত হতে হতে প্রায় নেই বললেই চলে। আর এরই বিপরীতে এই ছাত্রসমাজের একলা ঘরের দেশে ঢুকে পড়েছে ফেসবুকের মত সোস্যাল মিডিয়া, যেটা আপাত স্বাধীনতার জায়গা। বাস্তবজীবনের অবরুদ্ধ স্বাধীনতা আর ভার্চুয়াল স্পেসে মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা— এই দুই-এর দ্বন্দ্বে বড় হচ্ছে এই প্রজন্ম। একাধারে সে একা এবং সে লাখো লাখো। এই অংশের ছাত্রযুবরাই মিশরের তাহিরির স্কোয়ারে, ওয়ালস্ট্রীট অকুপাই, চিলিতে-গ্রীসে-হংকং-এ, দিল্লীতে নির্ভয়াকান্ডে, বাংলাদেশের শাহবাগে আইন-কানুনের বাধা উপেক্ষা করে, পুলিশের ব্যাটন-কাঁদানে গ্যাস, জলকামানের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে; আমাদের এখানে এরাই পরিকাঠামো, ক্লাসে হাজিরা আর যথাযথ ক্যাম্পাসিং-এর দাবিতে টুকরো টুকরো স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে, প্রাইভেট কলেজগুলোতে কর্তৃপক্ষের অগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ প্রতিরোধে, ভোকেশানাল-পার্টটাইম-প্রাইমারি-এসএসসি শিক্ষকদের আন্দোলনে, সিকিম কিংবা হিমাচল প্রদেশের আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। যাদবপুরের আন্দোলন তারই ধারাবাহিকতায় তৈরি। 'হোক কলরব' যেমন পূর্বোক্ত আন্দোলনগুলোর সাধারণ রূপের নিরিখে একগোত্রীয় তেমনই স্থানিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সে স্বতন্ত্র।

অপরিচিত মুখগুলোতে পরিচিত স্লোগানগুলোর সাথে শোনা যাচ্ছে নতুন নতুন স্লোগান; নতুন ভাষা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক। 'আলিমুদ্দিন শুকিয়ে কাঠ, শত্রু এবার কালীঘাট' —ছাত্রছাত্রীরা তাদের রাজনৈতিক অবস্থানটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। লড়াইটা বেধে গেছে সরকারের সাথে। বামফ্রন্ট সরকারের একনিষ্ঠ ছাত্রী (মমতা) বনাম ছাত্র/ছাত্রী সমাজ। আচার্য, অর্থাৎ রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের আশ্বাসে সেদিনের সমাবেশ প্রত্যাহৃত হলেও প্রতিবাদী কর্মসূচি চলতে থাকে। ২২ তারিখের কলরবের বদলা 'হোক ক্যালানো' আর 'হোক গর্জন' শিরোনামের তৃণমূলের মিছিল প্রকৃতই লোকহাসানোয় পরিণত হলো। জোর করে মিছিলে নিয়ে আসা বেশিরভাগই জানত না তারা কেন হাটছে, কেউ কেউ আবার জানালেন যে যাদবপুরের ছাত্রদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে হাঁটছে তারা।

ছাত্রছাত্রীদের এ আন্দোলনকে নকশাল-মাওবাদীদের (মাও-মাকু) আন্দোলন বলে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলেছে, বাইরের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিয়ে বহিরাগত তত্ত্বকে খাড়া করার চেষ্টা করেছে, মদ-গাঁজা-নেশার অভিযোগ নিয়ে এসেছে শাসকদল— কিন্তু কোনো তকমাই ধোপে টেকেনি; তৃণমূল যত মুখ খুলেছে ততই তার স্বরূপ উন্মোচন হয়েছে।

মহামিছিল আন্দোলনে অন্য মাত্রা যোগ করে। বিভিন্ন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা ভিডিও কনফারেন্স করে আন্দোলনে সমর্থন যোগায়, শহরের আশপাশে চন্দননগর-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর-কৃষ্ণনগর-কল্যাণী-ডায়মন্ডহারবার-জয়নগর-সোনারপুর-হাবড়া-মেদিনীপুর-বর্ধমান থেকে সুদূর শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ারে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়, দেশের নানান জায়গার নানান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে— দিল্লীর *জেএনইউ-ডিইউ*, প্রায় সবকটা *আইআইটি*র ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের সংহতিতে কর্মসূচি নেয়, এমনকি বিদেশেরও বহু জায়গা থেকে নানান প্রতিবাদ কর্মসূচির খবর আর ছবি আসতে থাকে।

আন্দোলনের চাপে ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সদলবলে নিগৃহীতা মেয়েটির বাড়ি যান এবং মেয়েটির বাবাকে আশ্বস্ত করেন (আরো কী কী বলতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়, কারণ তাপস পালের দলটি মেয়েদের শ্লীলতাহানিকে কীভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে তা নিয়ে বলতে যাওয়া অহেতুক), যাতে করে মেয়েটির বাবা পরদিনই বিবৃতি দেন যে রাজ্যসরকার গোটা ব্যাপারটা দেখবেন বলেছেন, ফলত যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান আন্দোলন অর্থাৎ ভিসি-র পদত্যাগের দাবি ভিত্তিহীন; যদিও এর কয়েকদিন আগেই তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন ভিসিকে। অর্থাৎ তিনি প্রায় ১৮০ ডিগ্রি পাল্টি খেলেন। অতীতেও এ ঘটনা আমরা দেখেছি, সম্প্রতি কামদুনিতেই দেখেছি। কিন্তু তাতে আন্দোলনের কিছুই

এসে যায় না। কেউ তৃণমূল হয়ে গেলেও তার সুবিচারের দাবি বদলে যাওয়ার কথা নয়, ভুলে যাওয়ার কথা নয় সেই দাবি করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মার খাওয়ার ইতিহাস এবং ক্যাম্পাস ডেমোক্রেসির, অধিকারের আন্দোলন। যদি তাই হত তাহলে এ আন্দোলনটা তৈরিই হত না, কেননা নিগৃহীতা মেয়েটি ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ, তার দলগত অবস্থাটা আগে থেকেই পরিষ্কার ছিল।

২৪শে এক গণকনভেনশন-এর কর্মসূচী ছিল। অন্তর্গত-বহিরাগত বিভেদ তুলে দিয়ে নানান জায়গার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাবিদ, আন্দোলনের কর্মী, শিক্ষকদের সমাবেশ হয়। গোটা ক্যাম্পাসের দেওয়ালগুলো চারকোল আর রঙ-তুলি দিয়ে বিদ্রোহ আর প্রতিবাদের ছবিতে ভরিয়ে তোলে পড়ুয়ারা। দেওয়ালগুলো বিদ্রোহের মূর্ত ক্যানভাস হয়ে ওঠে। ওদিকে ওদিনই তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির নেতৃত্বাধীন ৫ জনের একটি তদন্তকারী দলের নাম ঘোষণা করে সরকার যারা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে। এ কমিটি-ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত ২০১৩-এর গাইডলাইন অনুযায়ী হয়নি, অর্থাৎ ৫০ শতাংশের বেশি মহিলা বা প্রাক্তন বিচারপতি থাকার বিষয়টি অগ্রাহ্য করেই হয়। একই দিন বিমলাশঙ্কর নন্দ-র ফাইল করা PIL-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট রায় দেয় আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা যাবে না, গেটগুলোর বাইরে পুলিশ পোস্টিং করা হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সব জায়গায় আন্দোলন করা যাবে না, কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের জায়গা চিহ্নিত করে দেবে ইত্যাদি। এ আক্রমণ গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর। পড়ুয়ারা এসবের বিরুদ্ধে লড়বে সেটা স্বাভাবিকই।

সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশের পর ২৭ তারিখ হস্টেলের ১৫ জনকে যাদবপুর থানায় ডেকে পাঠায় এবং পরদিন ঐ ১৫ জনকেই লালবাজারে ডেকে পাঠায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঐ ১৫ জনের মধ্যে দু-জনকে গ্রেপ্তার করে ২৮শে আগস্ট ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য। হস্টেলের ছোট একটা অংশ তাদের মুক্তির ব্যাপারে সরব হয়, আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। এরা আন্দোলনেও অংশ নিয়েছিল কিনা কিংবা আন্দোলন দমন করার জন্য বেছে বেছে আন্দোলনকারীদেরই কাউকে কাউকে ফাঁসানো হচ্ছে কিনা সংবেদনশীল মহলে তা নিয়ে আলোচনাও ওঠে, কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ক্যাম্পাসের *টিএমসিপি* আর আঞ্চলিক তৃণমূলের ভূমিকা। তারা জানায়, এত আন্দোলন না হলে এসব গ্রেপ্তার টেপ্তার কিছুই হতো না, আন্দোলন বন্ধ করে দাও ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে, এমনকি হস্টেলের ছেলেদের *টিএমসি*-তে যোগদান করতেও বলে তারা। আন্দোলন না হলে কোনো পদক্ষেপই যে সরকার নেয় না সেটা বুক ফুলিয়ে বলতেও পারে দরবারী দলেরা। কী অদ্ভুত না? আবারো বলি যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের এবং অবশ্যই হস্টেলের ছাত্রদের সমসত্ত্ব ভাববেন না। আন্দোলনের একটা বড় শক্তি হস্টেলে থাকে, আবার খুবই প্রতিক্রিয়াশীল ছেলেরাও হস্টেলে থাকে। ভিসির পদত্যাগের দাবিতে যে ছেলেটি বা মেয়েটি আন্দোলিত হয় তাদের মধ্যেও পুরুষতন্ত্রের খারাপ চেতনাগুলো একদম নেই এমনটা তো হতে পারে না। যাদবপুর প্রতিনিয়ত সেই ভেতরের লড়াই-এর ফল্গুধারা প্রবাহমান; এমন অসংখ্য লড়াই হয়তো রোজ সামাজিক বিষয় হয়ে ওঠে না, কিন্তু 'হোক কলরব' একসাথে অনেকগুলো লড়াইয়ের যৌথ প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে— এটাই এ আন্দোলনটির মাহাত্ম্য।

আন্দোলন এগিয়েছে। অষ্টমীতে ম্যাডক্স স্কোয়ারে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে, নবমীতে সল্টলেকের লাবণীতে হোক কলরবের কর্মসূচি থেকে ছাত্রছাত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছে। পুজোর ছুটির মধ্যে সরকার এই অন্তর্বর্তীকালীন ভিসিকে স্থায়ী করেছে, রাজ্যপাল তাতে শীলমোহর দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস না করে আন্দোলন করছে— এ নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে, ছাত্রছাত্রীরা গণভোট করে প্রমাণ করে দিয়েছে ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এই ভিসিকে চাইছে না, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সময়ের সাথে সাথে আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছেন। গণভোটকে রাজ্যপাল অবৈধ বলেছেন। একটা গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষ তার মতামত জানালে সেটা অবৈধ বৈ কি! পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে কথা, যেখানে তুমি কেবল 'কে' সিদ্ধান্ত নেবে তাকে নির্বাচিত করার জন্য মতামত দিতে পারো, সে 'কী' সিদ্ধান্ত নেবে সে ব্যাপারে মতামত দেওয়ার তুমি কে হে? এ আন্দোলনের নানা কিছুর সাথে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফলে আন্দোলন থেকে পাওনার ঝুলিটা কিন্তু ক্রমাগত ফুলে ফেঁপে উঠছে। শুধু পাওয়া যায়নি নিরপেক্ষ তদন্ত, *আইসিসি* পুনর্গঠন, ছাত্রদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের বিচার বিভাগীয় তদন্ত আর ভিসির পদত্যাগের সদুত্তর। সে তো সিঙ্গুরের কৃষকও তার জমি এখনো ফিরে পায় নি। আশু দাবিগুলো সবসময় তৎক্ষণাৎ মেটে না। লড়াইটা আসলে একটা নড়বড়ে ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে নতুন সমাজ গড়ার, লড়াইটা তাই দীর্ঘ। প্রতিটা লড়াই আসলে সেই দীর্ঘ লড়াই-এর অংশ মাত্র। একটা লড়াই জন্ম দেয় অন্য আর একটার, যা প্রতি মুহূর্তে সেই বড় লড়াইটা গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। একটা সিঙ্গুর জন্ম দিয়েছে নন্দীগ্রামের, আরো অসংখ্য আন্দোলনের। নন্দীগ্রামের মহামিছিল যে পরিসর তৈরি করেছিল সেটা কি ছাত্রছাত্রীদের আজকের আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে কম গুরুত্ব রেখেছে? পড়ুয়ারা পড়াশোনা শুরু করেছে, সামনে সেমিস্টার-পরীক্ষাও দেবে তারা কিন্তু ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক অবস্থা তারা ফিরতে দেবে না, অস্বস্তিকে জিইয়ে রাখা হবে দৈনন্দিন কর্মসূচি আর অভিব্যক্তিতে।

প্রবন্ধ

শ্রম আইন সংশোধন প্রসঙ্গে

কুশল দেবনাথ

আমাদের দেশে প্রচলিত শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। সংশোধনীর বেশ কিছু প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় গৃহীতও হয়েছে। আগামী শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে যা পেশ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আগে রাজস্থান বিধানসভায় শ্রম আইন সংশোধনের কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, মধ্যপ্রদেশ সরকারও শ্রম আইনে কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব বিবেচনা করছে। এককথায় কেন্দ্রীয় সরকার সহ বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রচলিত শ্রম আইন সংশোধনের জন্য নানা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

বস্তুত, এদেশে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউসের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে শ্রম আইন সংস্কারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করে চলেছেন। প্রচলিত শ্রম আইন 'উন্নয়নের' পক্ষে বাধাস্বরূপ, তাই এর পরিবর্তন দরকার— এটাই তাদের বক্তব্য। এই কথা শোনা গিয়েছিল ২০০২-এ 'রবীন্দ্র ভার্মা কমিশন'-এর রিপোর্টে। যে রিপোর্টে প্রচলিত শ্রম আইনকে সরল করার কথা হয়েছিল। ২০১৪-তে কর্পোরেট হাউসের বিপুল সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি বিজেপি পরিচালিত বিভিন্ন রাজ্যকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে। যার প্রমাণ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি।

এদেশে শ্রম আইন আসার প্রেক্ষাপট

এদেশে প্রচলিত শ্রম আইনের বেশিরভাগটাই ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি। আধুনিক কলকারখানার পত্তনই হয়েছিল ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসনের সময়। স্বাভাবিকভাবে শিল্প চালানোর স্বার্থেই ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন শ্রম আইন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। যতদূর জানা যায় ১৮৬০-এ 'এমপ্লয়ার্স এ্যান্ড ওয়াকার্স (ডিসপিউট্স) অ্যাক্ট' গৃহীত হয়েছিল প্রথমে বোম্বাইতে। পরবর্তীতে ভারতের অন্যত্র এই আইন চালু হয়। এই আইনে বলা হয়েছিল যে, কোন শ্রমিক মালিকের অবাধ্য হলে তাকে জরিমানা বা গ্রেপ্তার করা যাবে। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ভিতকে মজবুত করার জন্যই এই আইন গৃহীত হয়েছিল। ১৯৩১-এ রয়্যাল কমিশন অন লেবর ইন ইন্ডিয়া এই আইনটি প্রত্যাহারের সুপারিশ করে। ১৯৩২-এ আইনটি প্রত্যাহৃত হয়।

১৮৮১-তে ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট পাশ হয়। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ছিল না। ঐ সময়ে ভারতে বস্ত্রশিল্পে কম পয়সায় নারী ও শিশুদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নেওয়া হতো। ফলে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মালিকরা। কারণ ঐ সময় ব্রিটেনে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের জোরালো উপস্থিতি ছিল। ফলত ল্যাঙ্কশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মালিকরা খুব কম মজুরিতে কিংবা নারী ও শিশুদের দিয়ে উৎপাদন করাতে পারত না। তাই তারা শোরগোল তুললো, ভারতে নারী ও শিশুদের কলকারখানায় কম মজুরিতে কাজ করানো হচ্ছে। পরবর্তীতে ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পপতিরাও এর সাথে যুক্ত হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট পাশ হলো। এই আইনে ৭ বছরের নীচে শিশুদের কলকারখানায় নিয়োগ বন্ধ হলো। ৭ থেকে ১২ বছরের শিশুদের কাজের সময় নির্ধারিত হলো ৯ ঘণ্টা। ১৯২০-তে ব্রিটিশরা শিল্প বিরোধ আইনের (ইনডাসট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট) প্রবর্তন করে। মূলত ঐ সময়কার শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট মোকাবিলা করার জন্য তারা এটা করে। ১৯২৯-এ সংশোধনী এনে 'কনসিলেটরি মেশিনারি' তৈরি হয়। ১৯৩৮-এ 'কনসিলেশন অফিসার' বিষয়টি আইনে যুক্ত হয়। ১৯৪৭-এর এপ্রিলে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে 'দি ইন্ডাসট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট ১৯৪৭' গৃহীত হয়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, শ্রম আইনের একটি বড়ো অংশই তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে। এই আইনের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা শুধুমাত্র ছিল না। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও এই আইনগুলি তৈরি হয়েছিল।

শ্রম আইন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন পরির্তনের যে প্রস্তাব নিয়ে আসছে তা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী, একথা আমরা বলেছি। কিন্তু তার মানে কি দাঁড়ায় যে চালু যে শ্রম আইন আছে সেটা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করছে? আমরা শ্রম আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি বেশিরভাগ শ্রম আইন এসেছে ঔপনিবেশিক আমলে। একে দুভাগে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত, যে সময়ে ভারতে বিভিন্ন শ্রম আইনগুলি তৈরি হচ্ছে, ঐ সময়টা উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের যুগ। পৃথিবীর লড়াকু মানুষরা দুনিয়া জুড়ে মুক্তির মহাকাব্য রচনা করছেন। সামাজিক সুরক্ষার যে বিভিন্ন বিষয়গুলি শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করার ক্ষমতা ব্রিটিশ শাসকদের ছিল না। সুতরাং তারা বাধ্য হয়েছে শ্রমিকদের কিছু রিলিফ দিতে, আইন প্রবর্তন করতে। বা উল্টোদিক থেকে বলা যেতে পারে, সংগঠিত আন্দোলনের জোরে শ্রমিকরা অধিকার আদায় করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, তারা এসব আইন প্রবর্তন করেছিল রাষ্ট্রকে

সুরক্ষিত করার জন্য। যদি কিছু আইন প্রবর্তন না করা যায় তবে শ্রমিকরা পথে নামবে বা বিপ্লব করবে। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে '৪৭ পরবর্তী কালেও একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন আইন তৈরি করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলি প্রধানত মালিকদেরই স্বার্থরক্ষা করে।

আমরা যদি প্রচলিত শ্রম আইনকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব বহু আইন আছে যা অসম্পূর্ণ, অনেক আইন আছে যা প্রয়োগ করা হয় না, যেসব আইন আছে তার বহু অংশই শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী।

কিছু উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যাক। মজুরি সংক্রান্ত আইনের ধারা ৯-এ (পেমেন্ট এন্ড ওয়েজেস অ্যাক্ট, সেকশন ৯) লেখা আছে, শ্রমিক যদি একদিন ধর্মঘট করেন শ্রমিকের ৮ দিনের পর্যন্ত মজুরি কাটা হতে পারে। তার মানে একজন শ্রমিক ৭ দিন যে শ্রম দিয়েছেন তার পয়সা পাবেন না। ঐ আইনে আরো বলা আছে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া যদি সংঘবদ্ধভাবে (concerted manner) শ্রমিকরা অনুপস্থিত হয়, তাহলে ৮ দিনের মজুরি কাটা যাবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা তা ঠিক করবে মালিক। ১৯৩৬-এর আইনের এই ভয়ংকর ব্যবস্থা আজো বহাল। কোন সরকার এর পরিবর্তন করেনি। শিল্প বিরোধ আইনের ১০ নং ধারায় বলা আছে— বছরের পর বছর ধরে যদি কাউকে ক্যাজুয়াল বদলি হিসেবে রেখে দেওয়া হয় স্থায়ী শ্রমিকের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য, তাহলে সেটা unfair labour practice হবে। অর্থাৎ বছরের পর বছর ধরে ক্যাজুয়াল রাখলে চলবে না, প্রমাণ করতে হবে স্থায়ী শ্রমিকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার মতলবও ছিল মালিকের। অন্যদিকে, গ্র্যাচুইটি কিংবা পিএফ আইনে বলা হয়েছে যে সময় মতো গ্র্যাচুইটি না দিলে বা শ্রমিকদের কাছ থেকে পিএফ-এর টাকা কেটে জমা না দিলে তা ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে। বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই, এ রাজ্যের বেশির ভাগ চটকল মালিকই গ্র্যাচুইটির টাকা শ্রমিকদের দেয়নি, কিংবা পিএফ-এর টাকা কেটে জমা দেয়নি। ক'জন মালিক শাস্তি পেয়েছে?

বস্তুত, এ দেশে আইনকে যারা বাস্তবায়িত করবে, সেইসব সরকারি আধিকারিকরা মালিকদের দৃষ্টিকোণে চলতে অভ্যস্ত। ফলে এখানে শ্রমিক স্বার্থ প্রধানত রক্ষিত হয় না। উদাহরণ বাড়ানোর দরকার নেই। নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রচলিত শ্রম আইন প্রধানত মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। তাহলে প্রশ্ন আসে, যদি প্রচলিত শ্রম আইন প্রধানত মালিকদেরই স্বার্থ রক্ষা করে, তাহলে শ্রম আইন পরিবর্তন নিয়ে কর্পোরেট হাউসগুলো এত চিৎকার জুড়েছে কেন? আমরা আগেই বলেছি প্রচলিত শ্রম আইন প্রধানত মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করলেও দীর্ঘ লড়াই করে শ্রমিকরা বেশ কিছু আইনি অধিকার অর্জন করেছে। আজ শ্রমিক আন্দোলনে যখন ভাঁটার পর্ব চলেছে, তখন ওই টুকু আইনি অধিকারও তারা কেড়ে নিতে চায়। স্থায়ী শ্রমিক প্রথা তুলে দাও, বন্ধ করো সামাজিক সুরক্ষা, কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করো, চালু করো হায়ার এন্ড ফায়ার প্রথা, সংকুচিত করো ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন। আর এই লক্ষ্যেই করো শ্রম আইন সংস্কার। এবং আমরা দেখব, মোদী সরকার কিংবা রাজস্থান সরকারের প্রস্তাবে এই ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ

কেন্দ্রের মোদী সরকার ও বিজেপি পরিচালিত রাজস্থান সরকারের প্রস্তাবগুলি এবার আমরা আলোচনা করবো। প্রথমেই আলোচনা করা যাক, রাজস্থান সরকার যে প্রস্তাবগুলি বিধানসভায় পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে সেগুলি নিয়ে।

ক) শিল্প বিরোধ আইনে বর্তমানে লেখা আছে, যেখানে ১০০-র কম শ্রমিক আছে এমন কোন শিল্পে ছাঁটাই করতে সরকারি অনুমতি লাগবে না। রাজস্থান সরকার সেখানে সংখ্যাটা ৩০০ করেছে। অর্থাৎ ২৯৯ পর্যন্ত যেখানে শ্রমিক আছে সেখানে ছাঁটাই করতে সরকারি অনুমতি লাগবে না। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয়, দেশের বর্তমান যত শিল্প শ্রমিক আছে তার বেশিরভাগ অংশকেই ছাঁটাই করতে মালিকপক্ষের আর কোন অনুমতি লাগবে না।

খ) ঐ প্রস্তাবে ট্রেড-ইউনিয়ন আইন সংশোধনেরও প্রস্তাব আছে। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য ন্যূনতম ১০০ বা ১০ শতাংশ শ্রমিককে জড়ো করতে হবে। ঐ সংখ্যাটা বর্তমানে করা হয়েছে ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ কোন কারখানায় ৩০ শতাংশ শ্রমিককে জড়ো না করতে পারলে ট্রেড-ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। এককথায় শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়ন করার অধিকারকে সংকুচিত করা হল।

গ) শ্রম আইন পরিবর্তনের প্রস্তাবে আছে, বর্তমানে ফ্যাক্টরি আইনে সংগঠিত শিল্প বলতে বোঝানো হয় বিদ্যুৎ সহ ১০ জন শ্রমিক যেখানে কাজ করেন অথবা বিদ্যুৎবিহীন ২০ জন শ্রমিক কাজ করেন। বর্তমান প্রস্তাবে বিদ্যুৎ সহ কারখানায় ২০ জন, বিদ্যুৎবিহীন কারখানায় ৪০ জন শ্রমিকের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এক বড়ো সংখ্যক শ্রমিককে সংগঠিত শিল্পের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

ঘ) বর্তমান কন্ট্রাক্ট লেবার আইনে কোনো কারখানায় ২০ জন শ্রমিককে নিয়ে ঠিকাদার কাজ করলে সেখানে কন্ট্রাক্ট লেবার আইন প্রযোজ্য হবে। কিন্তু রাজস্থানে সংখ্যাটা ৫০ করার প্রস্তাব আছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক ঠিকা শ্রমিককে আইনের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাজস্থান সরকারের সমগ্র প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব ছাঁটাই অবাধ করা, এক বড়ো সংখ্যক ঠিকা শ্রমিককে আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, ট্রেড-ইউনিয়ন

করার অধিকার সংকুচিত করা এবং সংগঠিত শিল্প শ্রমিকের সংজ্ঞা বদল করার মাধ্যমে মালিকদের আক্রমণকে আরো অবাধ রূপ দেওয়া হয়েছে।

এবার আমরা আলোচনা করবো মোদী সরকারের প্রস্তাব নিয়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে 'ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ১৯৪৮'-এর ওভারটাইম সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু রদ বদলের প্রস্তাব আছে।

ক) বর্তমান ফ্যাক্টরি আইনে ওভারটাইমের সময়সীমা এক পক্ষকালে ৫০ ঘণ্টা। বর্তমানে তা দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ ঘণ্টা করার প্রস্তাব আছে। আর 'পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস'-এর ক্ষেত্রে তা ১২৫ ঘণ্টা করার প্রস্তাব আছে, বর্তমানে যা আছে ৭৫ ঘণ্টা। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের কথা বলছে, অথচ ওভারটাইমের সময় বৃদ্ধি মানে কর্মসংস্থান কমবে, বাড়বে কাজের বোঝা।

দ্বিতীয়ত, ফ্যাক্টরি আইনের প্রধান কাজ কী? শ্রমিকের নিরাপত্তা, কাজের অবস্থা এবং শ্রমিকের ওয়েলফেয়ার দেখা। কিন্তু মোদী সরকার যে সংশোধনী এনেছে তাতে বলা হয়েছে : "Exemption to small firms with upto 40 workers against 10 currently from filling compliance reports" (অর্থাৎ বর্তমানে ১০ জনের কম শ্রমিক থাকলে রিপোর্ট করতে হয় না, বর্তমানে সেটা ৪০ করার প্রস্তাব আছে)। অর্থাৎ এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিককে ফ্যাক্টরি আইনের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে ৪০ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করেন সেখানে শ্রমিকের নিরাপত্তা, কাজের অবস্থা ও ওলেফেয়ার সম্পর্কে সরকারের কোন দায় থাকবে না। দেশের অর্ধেকের বেশি কারখানাকে আইনের আওতার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এদেশে শ্রমিক সংখ্যার নিরিখে কারখানার সংখ্যা

শ্রমিক সংখ্যা	*ফ্যাক্টরীর সংখ্যা*
০-১৪	৬৩,৫৬৮
১৫-১৯	১৮,৭৬৩
২০-২৯	২০,৫৪১
৩০-৪৯	২২,৪২৯
৫০-৯৯	২১,২২৯
১০০-১৯৯	১৩,৪২৯
২০০-৪৯৯	৯,০৯৪
৫০০-৯৯৯	৯,০৯৪
১০০০-১৯৯৯	৩,৫২৪
২০০০-৪৯৯৯	৯৪৮
৫০০০ এবং উর্ধে	৩৭৭

সূত্র: অ্যানুয়াল সার্ভে অফ ফ্যাক্টরিস, ২০১১-২০১২

শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানোর নামে অ্যাপপ্রেনটিশ আইন সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান অ্যাপপ্রেনটিশ আইনে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রেক্ষিতে শিক্ষানবীশ নেওয়া হতো। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষানবীশ ছাড়াও অ্যাপপ্রেনটিশ নিয়োগ করা হবে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, অ্যাপ্রেনটিশ নিয়োগের নামে বিভিন্ন শিল্পে কম পয়সায় মজুর খাটানোর আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হলো। এবং এরা অ্যাপপ্রেনটিশ, এই তকমাকে সামনে রেখে এদের দিয়ে কম পয়সায় পূর্ণ উৎপাদন করিয়ে নেওয়া হবে। আর প্রয়োজনে কাজ থেকে বিদায় করে দেওয়া যাবে। এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে: "Contractual workers, daily wages, agency workers and casual workers also come under apprenticeship act.", অর্থাৎ শিক্ষানবীশ বিষয়টি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। দক্ষ শ্রমিক গড়ার নামে শিক্ষা-শ্রমিকদের দিয়ে পূর্ণ উৎপাদন করে স্থায়ী শ্রমিক প্রথার অবসান ঘটানোর দিকে চলেছে মোদী সরকার।

আর একটি প্রস্তাবে নারী শ্রমিকদের নাইট শিফটে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (এই বিষয়টি নিয়ে একটি আলাদা আলোচনার প্রয়োজন। পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা আছে।)

শ্রম আইন ও শ্রমিক আন্দোলন

শ্রম আইনের সাথে শ্রমিকদের বাস্তব জীবনের গভীর যোগ আছে। আবার এটাও ঠিক, এদেশে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বয়স প্রায় ১০০ বছর হতে চললো। কিন্তু শ্রম আইনের সাথে শ্রমিক আন্দোলনের সংযোগ আজো দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠেনি। বহু শ্রমিক নেতা ভাবেন এটা তাত্ত্বিক বিষয়, এর সাথে বাস্তব শ্রমিক আন্দোলনের কোন যোগ নেই। আর বহু শ্রমিক ভাবেন, শ্রম আইন— ওটা কিছু নেতা আর আইনজীবীদের বিষয়। ফলে যে বিষয়টি শ্রমিকের জীবনের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে, সেই বিষয়টি শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় হয়ে না উঠলে শ্রম আইন বলুন বা শ্রম আইন পরিবর্তনের বিষয় বলুন, পুরোটাই অ্যাকাডেমিক বিষয়ই হয়ে থাকবে।

সুতরাং নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলন গড়তে হলে শ্রম আইনের বিষয়টি শ্রমিক আন্দোলনের এজেন্ডা করতেই হবে। পরিশেষে বলব, শ্রম আইনের সংশোধনের নামে মোদী সরকার ও কর্পোরেট লবি যে আক্রমণ নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জোরালো শ্রমিক আন্দোলন গড়তে হবে। পাশাপাশি শ্রম বিষয়টি যেহেতু যুগ্ম (কেন্দ্র ও রাজ্য) তালিকা ভুক্ত, রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে যে পরে আইন করে সেই আইনটিই প্রযোজ্য হয়। আজ যখন মোদী সরকার শ্রম আইন সংশোধনের নামে শ্রমিক বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করছে, তখন এ রাজ্যের সরকার এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করুক, এই দাবিও আজ তোলা জরুরি।

প্রবন্ধ

ভারত রাষ্ট্রে শ্রম আইন

কৌশিক ভট্টাচার্য

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা ও ১৪ ধারায় ভারতকে সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার, সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ২১ ও ২৩ ধারায় সমস্ত নাগরিকের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার, বেগার শ্রম না দেওয়ার অধিকারকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতের সংবিধানের ৩৯(সি), ৩৯-এ, ৪২, ৪৩ ধারায় রাষ্ট্রকে সম্পদ ও মালিকানার সুষম বন্টন, সকলের জন্য সমান বিচার, ভালো বেতন, কাজের মানবিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু স্বাধীন ভারতের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইন— শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭, ভারতের কারখানা আইন ১৯৪৮, ন্যূনতম মজুরি আইন ১৯৪৮ ও ঠিকা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও অবলুপ্তি আইন ১৯৭০ পর্যালোচনা করলে উল্টো চিত্র পাওয়া যায়।

কারখানা আইন, ১৯৪৮ : এই আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, নিরাপত্তা, কাজের সময়, ছুটি সংক্রান্ত বেশ কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের, কিন্তু এই আইনের ৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৬-এ, ৯৮ ধারায় আইনভঙ্গের জন্য সর্বোচ্চ ৬ মাস জেল ও জরিমানার বিধান থাকলেও আইনের ১০৫ ধারা থেকে পরিষ্কার যে রাষ্ট্রের শ্রম দফতরের অনুমোদন ছাড়া কারখানা আইন ভঙ্গের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। আইনের ১০৬ ধারা থেকে পরিষ্কার, অপরাধ ঘটার ৩ মাসের মধ্যে আদালত প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের শ্রম দফতরের অনুমোদন ছাড়া ন্যূনতম মজুরি আইন ভঙ্গের জন্য মালিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। এমনকি এখানেও অপরাধ ঘটার ১ মাসের মধ্যে আদালত প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের শ্রম দফতর শুরু করলে মালিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া যাবে না।

ঠিকা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও অবলুপ্তি আইন, ১৯৭০ : এই আইনেও ঠিকা শ্রমিকদের কিছু অধিকারের কথা বলা থাকলেও আইনের ৩ ও ৪ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে যে পরিকল্পনা পরিষদ রয়েছে, তার সুপারিশ সরকার মেনে চলতে বাধ্য নয়। আইনের ১০ ধারায় স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ প্রথার অবলুপ্তি ঘটানো হবে কিনা, সেটা রাষ্ট্রের শ্রম দফতরের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। এই আইনের ২৩ ও ২৪ ধারায় সর্বোচ্চ ৩ মাস জেল ও ১০০০ টাকা জরিমানার বিধান থাকলেও আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের শ্রম দফতরের সুপারিশ ছাড়া মালিকের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যাবে না। উপরন্তু আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী মালিকের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে তিন মাসের মধ্যে শ্রম দফতর কোন আদালতি ব্যবস্থা না নিলে আর কোন মামলা করা যাবেই না।

শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭ : এই আইনে ২(কে) ধারা থেকে এটা স্পষ্ট যে কোনো একজন বা অল্প কিছু শ্রমিক যৌথভাবে মালিকের বিরুদ্ধে শিল্প-বিরোধ দায়ের করতে পারবে না শ্রম দফতর পর্যন্ত, যদি না ট্রেড ইউনিয়ন তাদের পাশে দাঁড়ায়। ৬০-এর দশকের উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের চাপে পড়ে ১৯৬৫ সালে সরকার শ্রমিককে ছাঁটাই বা তৎসংক্রান্ত মামলা ব্যক্তিগতভাবে করার অধিকার দেয় নতুন ২-এ ধারা সংযোজন করে। সম্প্রতি মারুতি সহ উত্তর ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও হসপিটাল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশ ২-এ (২) ধারা সংযোজন করে ছাঁটাই বা তৎসংক্রান্ত মামলায় প্রায় সরাসরি শ্রমিককে আদালতে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সুযোগ দেয়। যদিও অন্যান্য শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে আজ অবধি শ্রমিকের, এমনকি ট্রেড ইউনিয়নেরও, সরাসরি মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করার মতো আইনি অধিকার নেই।

এই আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী একটি শিল্প বিরোধ দায়ের হবার পর মালিককে আলোচনায় টেনে আনতে বাধ্য করার কোন ক্ষমতা শ্রম দফতর বা শ্রমিকের হাতে নেই। আলোচনার মাধ্যমে শিল্প বিরোধটি মীমাংসা না হলে সেই শিল্প বিরোধটি বিচারের জন্য শ্রম আদালত বা শিল্প ট্রাইবুন্যালে পাঠানো হবে কিনা সেটা শ্রম দফতরের মর্জির ওপর নির্ভরশীল (রেফারেন্স : সেকশন ১০)। শিল্প ট্রাইবুন্যাল বা শ্রম আদালতের রায় (Award) যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকার আইনের ১৬, ১৭, ১৭-এ অনুযায়ী প্রকাশ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি রূপায়ণ করা যাবে না।

এই আইনের ২৫-টি, ২৫-ইউ, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩০-এ, ৩১ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস জেল ও ১০০০ টাকা জরিমানার বিধান থাকলেও এখানেও রাষ্ট্রের শ্রম দফতর ছাড়া অন্য কেউ মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারবে না। এর পাশাপাশি এই আইনের চ্যাপ্টার ফাইভ-বি অনুযায়ী লে-অফ, ক্লোজার, ছাঁটাই সংক্রান্ত প্রশ্নে শুধুমাত্র নীরব থেকে সরকারের শ্রম দফতর মালিকের এই সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুমোদন দিয়ে দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে PUDR Vs Union of India AIR 1982 SC মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে শ্রম আইন ভঙ্গ করে মালিকরা

এর পর ২৭ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

মার্কিন রোষানলে ভারতীয় ওষুধ শিল্প

প্রদীপ রায়

দেশের ওষুধশিল্প এক সংকটের মুখে। দেড় লক্ষ কোটি টাকার রপ্তানি-উদ্বৃত্ত এই শিল্পটি উৎপাদনের নিরিখে বিশ্বে ত্রয়োদশ স্থানাধিকারী। কিছু সরকারি নীতিকে আশ্রয় করে এই শিল্পের উত্থানকাল অনধিক ৩৫ বছর। এরই মধ্যে ২০০টির বেশি দেশে সস্তায় ওষুধ রপ্তানি দ্বারা অনুন্নত, এমন কি উন্নত দেশগুলির জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে ভারতীয় 'জেনেরিক' ওষুধ শিল্প। *এইচআইভি*, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের মহামারীর বিরুদ্ধে অনুন্নত দেশগুলির লড়াই-এর রসদ কার্যকর ও সস্তা ভারতীয় ওষুধ। এ হেন শিল্প সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিশেষত আমেরিকার চক্ষুশূল হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

পৃথিবীর প্রধান ওষুধ উৎপাদনকারী দেশগুলিতে এই শিল্প মুনাফার হারের নিরিখে উচ্চতম স্থানে রয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে ২০১২ সাল অবধি এই এক দশকে ১১টি সর্ববৃহৎ ওষুধ কোম্পানির মোট মুনাফার পরিমাণ ৭১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪২ লক্ষ কোটি টাকা) এবং শুধুমাত্র ২০১২ সালে মোট মুনাফার পরিমাণ ৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৫ লক্ষ কোটি টাকা (সূত্র : কোম্পানিগুলির বার্ষিক রিপোর্ট)। ২০১১ সালে মন্দার বছরে ফরচুন-৫০০ কোম্পানিগুলির মোট মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল ৫৩ শতাংশ, অথচ একই সময়ে আমেরিকার ১০টি বৃহৎ ওষুধ কোম্পানির মিলিত মুনাফা বেড়েছিল ৩২ শতাংশ (২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ২০০২ সালে ফরচুন-৫০০'র অন্তর্গত ১০টি ওষুধের কোম্পানির মোট মুনাফা হয় ৩৫.৯ বিলিয়ন ডলার, যা বাকি ৫৯০টি কোম্পানির মিলিত মুনাফার (৩৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) চাইতে বেশি। একই পত্রিকায় প্রকাশিত ২০১২ সালের রিপোর্টে ফরচুন-৫০০ অন্তর্গত আমেরিকার বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির মোট বিক্রির পরিমাণের তুলনায় নিট মুনাফার হার ছিল ১৫.৫ শতাংশ, যা অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এমন একটা লাভজনক শিল্পকে ঘিরে রাষ্ট্রের কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায়, রোগকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক কাজকর্ম, একচেটিয়া ব্যবসার অধিকারকে নিরঙ্কুশ করা, অনুন্নত দেশগুলির জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করার বিভিন্ন সংবাদ নিত্যই প্রকাশিত হবে এটা স্বাভাবিক। নানাবিধ কর ছাড় ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্য আমেরিকার ওষুধ কোম্পানিগুলি মার্কিন কংগ্রেসে প্রভাব বিস্তার করার জন্য যে বিপুল খরচ ১৯৯৯-২০০০ সালে করেছিল তার পরিমাণ ছিল ২৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (Public citizen-congresswatch)। রোগকে মূলধন করে অমিত মুনাফা অর্জন যে শিল্পের চালিকাশক্তি তাকে ঘিরে দুনিয়াব্যাপী অনৈতিক কাজকর্ম চলবে এটাই স্বাভাবিক। লাভজনক এই শিল্পের সিংহভাগ দখলে রয়েছে আমেরিকা এবং ইউরোপের কতিপয় ওষুধ কোম্পানির। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে আমেরিকার ৬টি ও ইউরোপের ৪টি— অর্থাৎ বিশ্বের মোট ১০টি বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানির মুনাফার বার্ষিক হার ৩০ শতাংশের বেশি এবং একবিংশ শতকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানে ওষুধের ৮৫ শতাংশ বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে এই ওষুধ কোম্পানিগুলি। ২০১২ সালে ওষুধের বিশ্বব্যাপী বাজার ছিল ৮৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাত্র ১০টি সর্ববৃহৎ ওষুধ কোম্পানির দখলে ছিল এই ব্যবসার ৪২ শতাংশ।

এ হেন লাভজনক শিল্পের সাথে যুক্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলি বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বে না এটাই প্রত্যাশিত। নানা আইনকানুন ও নিয়মের ফন্দিফিকিরে অবিরাম চেষ্টা চলছে নিজেদের একচেটিয়া অধিকারকে বজায় রাখতে। গ্যাট চুক্তি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি এই লক্ষ্যেই তৈরি করা। এর উপর রয়েছে মনোমত চুক্তি না হলে চুক্তিভঙ্গকারী এই অপবাদের দেশগুলির বিরুদ্ধে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পদ্ধতি। সাম্রাজ্যবাদী এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে তৈরি জনমত অগ্রাহ্য করে অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন দেশের শাসকশ্রেণী আত্মসমর্পণ করছে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তরের (*ইউএসটিআর*) বার্ষিক রিপোর্টে (যা স্পেশাল ৩০১টি রিপোর্ট নামে খ্যাত) মার্কিন ওষুধ কোম্পানিগুলোর চাপে ভারতকে "অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিদেশি রাষ্ট্র" (প্রায়োরিটি ফরেন কান্ট্রি) হিসাবে ঘোষণা করার সুপারিশ করেছে। এই তালিকায় রাখা হয় সেই রাষ্ট্রসমূহকে, যাদের বিরুদ্ধে আমেরকার অভিযোগ ঐ রাষ্ট্রগুলির বৈষম্যমূলক বা অকার্যকারী মেধাসম্পদ আইন ও শিল্পনীতির প্রভাবে (১) মার্কিন বৈদেশিক বহির্বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, (২) রপ্তানিতে আমেরিকা পিছিয়ে যায়, (৩) আমেরিকার উৎপাদন শিল্পে বৃদ্ধি কমে, (৪) ফলত দেশের অভ্যন্তরে বেকারি বাড়ে। ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের অভিযোগ— (১) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা'-র অন্তর্ভুক্তির সূত্রে ভারতীয় পেটেন্ট আইনের তিনদফায় পরিমার্জনার পরেও তা *ট্রিপ্স*-এর পরিপন্থী, (২) বর্তমান পেটেন্ট আইন দেশীয় ওষুধসংস্থাগুলির রক্ষাকবচ এবং বিদেশি ওষুধ সংস্থার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, (৩) পেটেন্ট আইনের অন্তর্গত 'কম্পালসারি লাইসেন্স' ব্যবস্থা ও ধারা ৩(ডি) (যে ধারায় 'এভারগ্রিনিং' অর্থাৎ প্রচলিত ওষুধের সামান্য রকমফেরে

তাকে নতুন ওষুধ হিসাবে গণ্য করে পুনরায় পেটেন্ট পাওয়ার দাবিকে অগ্রাহ্য করা হয়) *ট্রিপ্‌স*-এর পরিপন্থী, (৪) তথ্যের স্বাধিকার বা 'ডাটা এক্সক্লুসিভিটি' সংক্রান্ত নিয়ম *ট্রিপ্‌স*-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে চালু হয়েছে স্পেশাল-৩০১ মারফত ভারত থেকে আমদানির ক্ষেত্রে নানারকম বিধিনিষেধ চালু করার হুমকি। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০১২ সালের তুলনায় মাত্র ১.৭১ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে আমেরিকা ভারতে রপ্তানি করে ২১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ভারত আমেরিকায় রপ্তানি করে ৪১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভারত সরকার এযাবৎ উপরোক্ত অভিযোগগুলি নস্যাৎ করেছে যুক্তি সহকারে। এমনকি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতানুসারেও ভারতীয় পেটেন্ট আইনের ধারাগুলি *ট্রিপ্‌স*-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সম্প্রতি নোভার্টিসের ক্যানসারের ওষুধ 'গ্লিভেক' সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টও ভারতীয় পেটেন্ট আইনের ৩ (ডি) ধারা ও প্রাক্-পেটেন্ট ধারাটিকে পেটেন্ট-উত্তর বিরোধিতাকে খারিজ করে মান্যতা দিয়েছে।

ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে আমেরিকার দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করানোর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাতিয়ার স্পেশাল-৩০১।

সম্প্রতি অপর একটি ঘটনায় মার্কিন সরকার রুষ্ট। দেশের জনসাধারণের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধের লভ্যতা ও ক্রয়ের সঙ্গতি একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই কারণেই এই শিল্পে মূল্য নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা সর্বজনস্বীকৃত। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু রয়েছে বিভিন্ন দেশে। আমাদের দেশে ওষুধের মূল্য নির্ধারণের নীতি ছিল নির্দিষ্ট হারে স্থিরীকৃত মুনাফাযুক্ত উৎপাদন ব্যয়ভিত্তিক নির্ধারণ পদ্ধতি, যাকে বলা হয় 'কস্ট বেসড্ প্রাইসিং' ব্যবস্থা। বিগত বছরে এই নীতির পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান বাজারের "ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর মূল্য নির্ধারণ" নীতি চালু হয়েছে, যাকে বলা হয় 'মার্কেট বেসড্ প্রাইসিং' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় একটি মৌল ওষুধের বর্তমান বাজারে সব চাইতে চালু ব্রান্ডগুলির গড় মূল্যই হবে ঐ মৌল ওষুধের সর্বোচ্চ দাম। ১৯৯৭ সালে ওষুধের মূল্য নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার একটি স্বাধীন সংস্থা তৈরি করে, যার নাম *এনপিপিএ* (ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি)। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই সংস্থা ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য স্থির করে। ২০১৩ সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে এই সংস্থা অত্যাবশ্যক ওষুধের একটি তালিকা তৈরি করে ৩৪৮টি মৌল ওষুধকে নিয়ে, যার নাম হয় ন্যাশনাল লিস্ট অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন বা *এনএলইএম*। ওষুধগুলিকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত করে এই সংস্থা এদের সর্বোচ্চ দাম স্থির করে দেয়। বহু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তালিকাভুক্ত ওষুধগুলির লাগামছাড়া দামবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হয়। যেহেতু নির্দেশটি সুপ্রিম কোর্টের তাই এই তালিকার বিরুদ্ধে ওষুধ কোম্পানিগুলির পক্ষে আইন আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ ছিল না। ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলি তালিকার বাইরে থাকা ওষুধগুলির স্বপক্ষে আগ্রাসী প্রচার চালিয়ে এবং কতিপয় অনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করে ওষুধগুলিকে চিকিৎসার কেন্দ্রভূমিতে নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্যারাসিটামল (ক্রোসিন/ক্যালপল) ৫০০ মিগ্রা মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় থাকায় ইদানীং মূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা প্যারাসিটামল ৬৫০ মিগ্রা/৩৭৫ মিগ্রা-র প্রেসক্রিপশন বেড়েছে। একই ভাবে ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস ক্যানসার, *এইচআইভি* বা যক্ষ্মার চিকিৎসায় (যে রোগের মোকাবিলায় দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খেতে হয়) মূল্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত ওষুধগুলির ব্যবহার বেড়েছে। উচ্চদামের এই ওষুধগুলি ক্রমশ রোগির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। জনরোষের আঁচ অনুভব করে ওষুধের মূল্যনিয়ন্ত্রক সংস্থা *এনপিপিএ* গত ১০ জুলাই এক নির্দেশিকা মারফত ঐ ঔষুধগুলোর সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয়। *ডিপিসিও*-র ১৯ নম্বর পরিচ্ছেদে *এনপিপিএ*-কে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের বাইরের ওষুধের লাগামছাড়া দাম বৃদ্ধি হলে রোগির স্বার্থে ঐ ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। ক্ষিপ্ত ওষুধকোম্পানিগুলি (বৃহৎ ও বহুজাতিক) দিল্লী ও মুম্বাই হাইকোর্টে এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশের আবেদন জানায়, যদিও কোর্ট তা অগ্রাহ্য করে। ওষুধ কোম্পানিগুলি এবার দরবার করে সরকারের কাছে। 'শিল্পবান্ধব' সরকারের নির্দেশে ভেষজদপ্তর 'সলিসিটার জেনারেলের' সম্মতিতে *এনপিপিএ*-কে ঐ নির্দেশিকা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়। সরকারের বক্তব্য, অনুচ্ছেদ ১৯ ব্যবহৃত হবে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। এই বিশেষ অবস্থা নির্ধারিত হবে শিল্পের স্বার্থে।

এত দ্রুত গতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে আরও একটা বড় তাগিদ ছিল। মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর বহু আলোচিত মার্কিন সফরের পথ মসৃণ করতে এবং বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলিকে খুশি করতেই ঐ সিদ্ধান্ত। প্লানিং কমিশন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন আইনসম্মত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাঙ্গা বা পঙ্গু করার যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে *এনপিপিএ* এই তালিকায় নতুন সংযোজন। এখানেই শেষ নয়। ভারত-মার্কিন এই দুই দেশের বাণিজ্যনীতি সংক্রান্ত ফোরামের সিদ্ধান্তানুসারে একটি উচ্চ পর্যায়ের মেধাস্বত্বজনিত ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হবে, যারা বছরে একবার মিলিত হবে এবং আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নেবে যাতে উদ্ভাবনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে উভয় দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করা যায় এবং কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাকে এড়িয়ে দেশের সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের এ এক নির্লজ্জ উদাহরণ। আশার কথা, বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়নসহ স্বাস্থ্য ও ওষুধ আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন ও সক্রিয় কর্মীরা সরকারের আপোষকামিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার।

প্রবন্ধ

ঠিকা শ্রমিক ও কয়লা শিল্পের কথা

প্রশান্ত হালদার

কোল ইন্ডিয়ার অন্তর্গত পাঁচটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'হাই পাওয়ার কমিটি' গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩-তে কয়লাশিল্পের ঠিকা শ্রমিকদের বেতন মান নির্ধারণ করেছিল। এতে অদক্ষ, আধা-দক্ষ, দক্ষ ও অতি-দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ক্রমান্বয়ে ৪৬৪ টাকা, ৪৯৪ টাকা, ৫২৪ টাকা ও ৫৫৪ টাকা দৈনিক মজুরি নির্ধারিত করা হল। ১ নভেম্বর ২০১১ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ২০, ২৭, ৩২ ও ৩৮ টাকা পরিবর্তনশীল মহার্ঘ ভাতা (Variable Dearness Allowance) যোগ করলে দৈনিক মজুরি দাঁড়ায় ক্রমান্বয়ে ৪৮৬, ৫২১, ৫৫৬ ও ৫৯২ টাকা। ১ এপ্রিল ২০১৪ থেকে এই বেতনক্রম কার্যকর হয়েছে। এর আগে ১ অক্টোবর, ২০১২ থেকে ঠিকা শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ও পরিবর্তনশীল মহার্ঘ ভাতা মিলিয়ে দৈনিক মজুরি ছিল ক্রমান্বয়ে ১৮৬, ২৩১, ২৭৯ ও ৩২৪ টাকা। অবশ্য এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয় যে এই নির্ধারিত মজুরিও আদায় করার জন্যে অনেক ঝামেলা বা আন্দোলন করতে হত। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে এই নির্ধারিত মজুরি আদায়ের লড়াইতে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। বর্তমান চুক্তিরও কী পরিণতি হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। প্রায়শই যেখানে ঠিকা শ্রমিকদের নাম অবধি খাতায় নথিভুক্ত হয় না, সেখানে প্রশ্নচিহ্ন অবশ্যই থেকে যায়। তবুও বর্তমান চুক্তির সরকারি প্রতিক্রিয়া হলো যে এর ফলে সরকারের একশো কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। অন্যদিকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের একাংশের বক্তব্য হলো যে কোল ইন্ডিয়ার স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির থেকেও অনেক কম মজুরি নির্ধারিত করে 'সম কাজে সম মজুরি'র দাবিকে নস্যাৎ করা হলো। তার সাথে ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের দাবির ওপরেও তালা লেগে গেল।

ইদানীং প্রায়শই শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনাগুলি মূলত ঠিকা শ্রমিকদের সমস্যাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনগুলির চিত্রও একই রকম, শুধু তাই নয়, শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার অশান্তির ক্ষেত্রে প্রায়শই ঠিকা শ্রমিকরাই আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়ে। বিগত কয়েক বছরে শিল্পে হিংসাত্মক ঘটনাগুলির জন্যেও ঠিকা শ্রমিকদের দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে। তাদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃংখলতার অভিযোগ উঠেছে, তাদের জেলে পাঠানো হয়েছে। আসলে অনেক কম মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চনা ও 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'-এর শ্রমনীতিতে কাজ করার বাধ্যবাধকতা ঠিকা শ্রমিকদের শিল্পে সংঘর্ষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে ঠিকা প্রথায় উৎপাদন বর্তমান যুগের বাধ্যবাধকতা। এটা পরিবর্তিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবদান ও বর্তমানে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বেরও কারণ। যদিও আধুনিক শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারি প্রথা ও ঠিকা-শ্রমিকদের উপস্থিতির ইতিহাস অনেক পুরনো। কিন্তু আজকের যুগের পরিবর্তিত উৎপাদন প্রক্রিয়া ঠিকা-শ্রমিকদের গুরুত্ব ও সংখ্যা, দুটোই অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা কোনো একটি বিচ্ছিন্ন শিল্পের ঘটনা বা কোনো একটি বিশেষ দেশের ঘটনা নয়, এটা আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য। কয়লা শিল্পে ঠিকা-শ্রমিকদের বিষয়কেও এই আলোকেই দেখা উচিত। অতএব আলোচনায় প্রবেশ করার আগে বিশ্ব জুড়ে পুঁজির কাঠামো ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন এসেছে সংক্ষেপে হলেও সেটা জেনে নেওয়া দরকার।

বিশ্বপুঁজির কাঠামো ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন

১৯৭০-এর দশক থেকেই বিশ্বপুঁজি বিনিয়োগের সংকটের মুখোমুখি হতে শুরু করে। এই সংকট থেকে বেরোনোর জন্য বিশ্ব-পুঁজিবাদ পুরনো রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তথাকথিত 'কল্যাণকর রাষ্ট্রে'র মডেলকে পরিত্যাগ করে পুঁজির অবাধ ও মসৃণ প্রবাহকে সুনিশ্চিত করার জন্য তথাকথিত 'নয়া উদার অর্থনীতি'র পথ গ্রহণ করল। আমেরিকা ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে গোটা বিশ্বে এই অর্থনীতির প্রয়োগ শুরু হল। এই পরিকল্পনার অনুসারী হিসেবে বিভিন্ন দেশগুলির সরকার নিজের নিজের বাজার ও অর্থনীতিকে 'নয়া উদার অর্থনীতি'র ছাঁচে ঢেলে সাজাতে শুরু করল। নাম দেওয়া হল 'কাঠামোগত সংস্কার' (Structural Adjustment) কর্মসূচি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে দেশি ও বিদেশি পুঁজি অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র পেল। শুরু হল পুঁজির বিশ্ব পরিক্রমা। নাম 'বিশ্বায়ন'। এর ফলে গোটা বিশ্ব জুড়ে পুঁজির আসা-যাওয়ার গতি অনেক বেড়ে গেল। সাথে সাথেই পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করা হল। এই সময়কালে বিশ্বপুঁজির অভিভাবক হিসাবে একেবারে সামনে চলে এলো 'আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার' (International Monetory Fund) এবং 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' (World Trade Organisation), যারা নাকি বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন, বাণিজ্য, উন্নয়ন, প্রগতি এমনকি দারিদ্র্য দূরীকরণেরও সর্বোচ্চ ঠিকাদার। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শিকার হল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, যেখানে সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল সহজলভ্য।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে

কোথাও নিজস্ব শাখাপ্রশাখা খুলে ফেলল, আবার কোথাও তৃতীয় বিশ্বের শিল্পগুলির সাথে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রাংশ নির্মাণ শিল্পকে প্রচুর সংখ্যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চালান করল। এই প্রক্রিয়াতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হল। আলাদা আলাদা দেশে তৈরি যন্ত্রাংশ নিয়ে এসে মূল কারখানাতে সংযুক্তিকরণ বা অ্যাসেম্বল করা হতে লাগল। ওপর ওপর এটা মনে হতে পারে যে এটা উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু সব মিলিয়ে নতুন স্তরে উৎপাদনকে আসলে বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীকরণ করা হল। যাতে পুঁজির আধিপত্য আরও বৃদ্ধি পেল।

এই নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৃহদাকার কর্পোরেশনগুলি তাদের মূল উৎপাদন কেন্দ্রের আকার ছোট করে ফেলল এবং শ্রমিকদের সংখ্যাও কমিয়ে দিল। উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই বিপুল পরিমাণ বিকেন্দ্রীকরণ ছোট বড় ভেন্ডার সংস্থা ও ঠিকা শ্রমিকদের সংখ্যা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল। এই প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের কাজ ঠিকা-প্রথায় করানো বা আউটসোর্সিং করার ফলে স্থায়ী শ্রমিকদের তুলনায় ঠিকা শ্রমিকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেল। ঠিকাপ্রথায় কাজ উৎপাদনের মুখ্য ভূমিকায় এসে গেল। এই প্রক্রিয়াকে পাকাপোক্ত করার জন্য নমনীয় শ্রমনীতির নামে এক এক করে শ্রমিকদের এতাবৎকালের অর্জিত অধিকারগুলিকে কেড়ে নেওয়া শুরু হল এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' পলিসিতে ঢেলে সাজানো হল। এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হল শ্রমের অবাধ ও নিরঙ্কুশ শোষণকে সুনিশ্চিত করা, যাতে পুঁজি উচ্চহারে মুনাফা অর্জন করতে পারে এবং শ্রমিকদের দর কষাকষির ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। বলা হয় উচ্চহারে মুনাফা দুনিয়াটাকে অনেক ছোট করে দেবে। দুনিয়াটা ছোট হল কিনা এটা গবেষণার বিষয় হতে পারে, কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থান অবশ্যই খাটো হয়ে গেল। তারা নিজেদের অর্জিত অধিকার হারিয়ে অসংগঠিত বা ঠিকা শ্রমিকে রূপান্তরিত হল। শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে এতাবৎকাল পর্যন্ত এটা সবচেয়ে বড় সংগঠিত আক্রমণ।

বিশ্বায়নের পথিক ভারত

ভারতে বিশ্বায়নের নীতিগুলি বেসরকারিকরণ (Privatisation), উদারনীতিকরণ (Liberalisation), বিশ্বায়ন (Globalisation) নামে প্রচলিত— যা সব মিলিয়ে নয়া অর্থনীতি নামে পরিচিত। ১৯৯০-এ ঋণ সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকটাই সাম্রাজ্যবাদী চাপে ভারত সরকার এই নীতিগুলিকে রূপায়ণের কাজ ত্বরান্বিত করল। বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধাগুলি সরানো হল। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের পথ গ্রহণ করা হলো। সরকারি সংস্থাগুলি একের পর এক ব্যক্তি-মালিকানাধীন ক্ষেত্রের হাতে তুলে দেওয়া হল। ছাঁটাই, স্বেচ্ছা-অবসর, লক আউট এবং বৃহদাকারে ঠিকাদারি প্রথা শিল্প জগতের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলো। নমনীয় শ্রমনীতির নামে শ্রম আইনগুলির সংস্কার কিম্বা শ্রম আইনগুলি কার্যকর না করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হল। শ্রম দপ্তরকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করা হল কিম্বা খোলখুলি মালিকপক্ষের সমর্থনে দাঁড় করানো হলো। অন্যদিকে বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার জন্য একের পর এক বিভিন্ন ছাড় দেওয়া হল। আদালতগুলিও শ্রম-বিবাদের ক্ষেত্রে পুঁজির পক্ষে একতরফা রায় দেওয়া শুরু করল। স্থায়ী চরিত্রের কাজে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ এক সাধারণ চিত্র পরিগ্রহ করল। যা এপর্যন্ত 'ঠিকা শ্রমিক আইন, ১৯৭০' দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। স্থায়ী শ্রমিকদের জায়গা নিতে শুরু করল ঠিকা শ্রমিকরা।

'বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীকরণ'-এর উৎপাদন পদ্ধতি ভারতে চালু হলো। মুখ্য উৎপাদন কেন্দ্রের আকার ছোটো করে উৎপাদনের অন্য প্রক্রিয়াগুলিকে হয় আউটসোর্সিং করা হল, নয়তো ঠিকা প্রথায় নিয়ে যাওয়া হলো। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরের ভেন্ডার কোম্পানিগুলো মারফত উৎপাদন-শৃঙ্খলা ছোট ছোট ওয়ার্কশপ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফলে বিরাট আকারে অসংগঠিত ক্ষেত্র ও অসংগঠিত শ্রমিকদের সৃষ্টি হল। এর থেকে আরও এগিয়ে এমনকি বড় বড় কারখানার মধ্যেকার উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও ঠিকা শ্রমিক বা ক্যাজুয়াল শ্রমিকেরা মুখ্য উৎপাদকে পরিণত হল। কোথাও কোথাও তো ঠিকা শ্রমিকরাই বাস্তবে সমস্ত উৎপাদন করতে লাগল, মুষ্টিমেয় স্থায়ী শ্রমিক ঠিকা শ্রমিকদের কাজ করানোর ভূমিকা গ্রহণ করল। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যাই হোক না কেন একই ছাঁচে ঢেলে ফেলা হল। বরং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এ কাজটা একটু বেশি পরিমাণেই হল। ভি ভি গিরি ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউট-এর সমীক্ষায় জানা গেছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫৫% কাজ ঠিকাপ্রথায় হয়, আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এর পরিমাণ ৪৫%। এই প্রক্রিয়ার ফলে ভারতে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নমুখী এবং ঠিকা ও অসংগটিত শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই উর্ধ্বমুখী। এটাই নাকি 'কর্মসংস্থান-সৃজন' (Employment generation)! এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর ভর করেই উন্নয়নের হারকে শীর্ষে পৌঁছে দেবার দাবি করা হয়।

গত ১৬ জুলাই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী রাজ্যসভায় বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারি পাবলিক সেক্টরে ২.৬৩ লক্ষ ঠিকা শ্রমিক আছে এবং স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১১.২৫ লক্ষ। তিনি একথাও বললেন যে ২০০৯-১০ সালে ৪৩.৭ কোটি শ্রমিক ছিল অসংগঠিত ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মেহনতি মানুষের ৯২ শতাংশের বেশি মানুষ ছিলেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যাদের জন্য কোনো শ্রম আইন নেই। যদিও ঠিকা শ্রমিকের সঠিক পরিসংখ্যান বলা খুবই কঠিন। এক তো এদের সংখ্যা কমা-বাড়া হতে থাকে, দ্বিতীয়ত, সব ঠিকাদাররা

লাইসেন্সধারী নয়। যার ফলে তাদের অধীন কর্মরত শ্রমিকরা হিসাবের আওতায় আসে না। এছাড়া অনেক ঠিকাদারই নিজেদের অধীনে কর্মরত শ্রমিকের বাস্তব পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করান না। ভি. ভি. গিরি ন্যাশন্যাল লেবার ইনস্টিটিউট-এর একটি সমীক্ষায় জানা যায়, দেশে ৩.৬ কোটি ঠিকা শ্রমিক কর্মরত, যাদের মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপ) আইন, ১৯৭০-এর আওতায় আছেন। পরিসংখ্যান যাই হোক না কেন সন্দেহের অবকাশই নেই যে বর্তমান উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বেশ ভালো সংখ্যায় ঠিকা-শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিক আছেন।

এই প্রক্রিয়াকে আরও পাকাপোক্ত করার সমস্ত রকম তোড়জোর চলছে। বিগত পাঁচ-সাত বছরে বিশেষ করে অটোমোবাইল ক্ষেত্রে শিল্প-অসন্তোষগুলি সরকারকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে ঠিকা-শ্রমিকদের বিষয়টি সতর্কভাবে মোকাবিলা করতে হবে। কিছু অর্থনীতিবিদ ঠিকা-শ্রমিকদের করুণ অবস্থা নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করলেন। কয়েকজন বললেন, ঠিকা-শ্রমিকদের বেতন খুবই কম, যা নাকি সমস্যার মূল কারণ। বাকি একদল বললেন, ঠিকা শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ অমানবিক— যা তাদের বিক্ষোভ বাড়াচ্ছে। আর একদল এও বললেন যে, স্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকা শ্রমিকদের বেতনের ব্যবধান অনেক বেশি, যার ফলে তাদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। কেউ কেউ সুপারিশ করলেন যে, যেখানে ঠিকা-শ্রমিকরা স্থায়ী শ্রমিকদের মত কাজ করেন, সেখানে তাদের স্থায়ী শ্রমিকদের সমান মজুরি দেওয়া হোক। কিন্তু কেউ একথা বললেন না যে, বছরের পর বছর যে ঠিকা-শ্রমিকরা স্থায়ী চরিত্রের কাজ করে আসছেন তাদের মূল নিয়োগকর্তার স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক বা তাদের স্থায়ী চাকরী দেওয়া হোক— যা কিনা ঠিকা-শ্রমিক আইন, ১৯৭০ স্বীকৃত। কিন্তু এই বিষয়ে বর্তমানে এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলতে শুরু করেছে যে, স্থায়ী চরিত্রের কাজে ঠিকা-শ্রমিক নিয়োগ নিষেধের অর্থ এই নয় যে স্থায়ী প্রকৃতির কাজে কর্মরত শ্রমিকদের মূল নিয়োগকর্তার শ্রমিক বলে মেনে নিতে হবে। যদিও '৮০-র দশক অবধি এমন প্রচুর উদাহরণ আছে যেখানে এইরকম ঠিকা-শ্রমিকদের মুখ্য নিয়োগকর্তার শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বর্তমানে শিল্পপতিরা শ্রমের বল্গাহীন শোষণের জন্য ও বেশি বেশি মুনাফার লোভে সব ধরনের কাজ ঠিকা-শ্রমিকদের দিয়ে করানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। যুক্তি দেখানো হয় যে বাজারের ওঠানামার সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রমিক নিয়োগ করার নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাতে ইচ্ছেমতো নেওয়া বা তাড়ানোর স্বাধীনতা থাকে। এই সুবিধা ঠিকা-প্রথাতেই পাওয়া সম্ভব, যেখানে লোক নেওয়া বা তাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

এখন ঠিকাদারি প্রথার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অসুবিধা সৃষ্টি করছে, সেগুলোকে অপসারণের জন্য শিল্পপতিরা ১৯৭০ সালের ঠিকা শ্রমিক আইন সংশোধনের সুপারিশ করছে। তাদের প্রস্তাব এই আইনের ১০ নং ধারাটি বিলোপ ঘটানো হোক, যার দরুন স্থায়ী চরিত্রের কাজে ঠিকা-প্রথা নিষিদ্ধ। এমনকি এই আইনের 'বিলোপ' শব্দটিকেই তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে 'ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ) আইন' নামকরণ করার কথা বলা হচ্ছে। বিনিময়ে ঠিকা-শ্রমিকদের কিছু অন্য সুবিধা ও বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পয়সা বাড়িয়ে অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। জাতীয় শ্রম কমিশন তো অনেক আগে থেকেই এই ধরনের সুপারিশ করে আসছে। বর্তমানে শিল্পপতিদের দিক্ নির্দেশে মোদী সরকার হয়তো খুব শীঘ্রই এই সব সুপারিশকে আইনে পরিণত করার চেষ্টা করবে। যার ইঙ্গিত পাওয়া গেল হালে ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ইত্যাদি সংশোধনের মাধ্যমে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কয়লা শিল্পে 'হাই পাওয়ার কমিটি' তৈরি করে কোল ইন্ডিয়ার ঠিকা-শ্রমিকদের নতুন বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এই লেখায় আমাদের আলোচ্য।

কয়লা শিল্পে ঠিকা শ্রমিক

১৯৭১ ও ১৯৭৩ সালে দুটো কিস্তিতে কোকিং ও নন-কোকিং কয়লা খনিগুলির জাতীয়করণ করা হয়েছিল। এর পরে ন্যাশনাল কোল মাইন্স অ্যাক্ট অনুসারে মাটির তলার সমস্ত কয়লা সম্পদ সরকারের হয়ে গেল। এই আইনের আওতাতেই কোকিং ও নন-কোকিং কোলের সমস্ত খনিগুলিকে মিলিয়ে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড গঠিত হল। কয়লা খনির জাতীয়করণের পেছনে যুক্তিগুলি হলো : ১) দেশে বর্ধমান কয়লার চাহিদা অনুসারে কয়লা উৎপাদন বাড়ানো এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা; ২) যেমন তেমন ভাবে কয়লা খনন বন্ধ করে জাতীয় সম্পত্তির অপচয়ের বিরুদ্ধে লাগাম লাগানো; ৩) কয়লা ভাণ্ডার থেকে পরিকল্পিতভাবে কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা; ৪) খনি সুরক্ষার নিয়মগুলি যথাযথ পালন করা; ৫) কয়লা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা; ৬) পরিবেশ সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করার জন্য খনি থেকে কয়লা তুলে নেবার পর তার মধ্যে পর্যাপ্ত মাত্রায় বালি ভরে সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

বর্তমান সরকারি নীতিগুলি তো এটা প্রমাণ করা জন্য উঠেপড়ে লেগেছে যে খনিগুলি জাতীয়করণের কাজটিই ভুল ছিল। কয়লা খনিগুলিকে আবার নতুন করে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কোথাও বিশ্বব্যাঙ্ক দ্বারা তৈরি ব্যবস্থাপত্র 'আউটসোর্সিং'-এর মাধ্যমে কাজটি করা হচ্ছে, তো কোথাও ব্যক্তি মালিকদের মধ্যে বড় আকারে কোল ব্লকগুলির বণ্টন করা হচ্ছে। সাথে খনির বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঠিকা

শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। ফলে কোল ইন্ডিয়ার স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে এবং কয়লা শিল্পে ঠিকা-শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয়করণের সময় কয়লা শিল্পে সাত লক্ষ স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন, আর বার্ষিক উৎপাদন ছিল সত্তর মিলিয়ন টন। বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমে প্রায় সাড়ে তিন লাখে এসে পৌঁছেছে এবং আউটসোর্সিং-এর ওপর ভর করে উৎপাদন চারশো বাষট্টি মিলিয়ন টনের ওপরে পৌঁছে গেছে। এটা কোনো লুকোনো ব্যাপার নয় যে এর মধ্যে ৫০% -এর বেশি উৎপাদন ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে করানো হয়।

এটা সবাই জানে যে কয়লা কাটা, মাটি পাথর কাটা, কয়লা বোঝাই করা, কয়লা বহন করা ইত্যাদি সবই স্থায়ী চরিত্রের কাজ। এই কাজগুলিতে ঠিকা-প্রথার প্রবেশ আইনত নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও শ্রম মন্ত্রক ও কয়লা মন্ত্রকের যোগসাজশে এই সমস্ত কাজে অবাধে ঠিকাদারি-প্রথা চলছে। যার ইংরাজী নামকরণ করা হয়েছে আউটসোর্সিং। এতে ঠিকাদারদের উৎপাদনের ঠিকা দিয়ে দেওয়া হয়। তারা খুব কম বেতনে ঠিকা-শ্রমিকদের দিয়ে উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এমনকি ব্যবহারযোগ্য শোভেল মেশিন, পে-লোডার ও ডাম্পারগুলিও তারা ভাড়া করেই কাজ চালান। এইভাবে খুব কম পুঁজি বিনিয়োগ করে ঠিকাদাররা মালামাল হয়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদিত কয়লাকে নিজের উৎপাদন দেখিয়ে এবং বিক্রি করে কোল ইন্ডিয়া মহারত্ন কোম্পানির খেতাব অর্জন করেছে। এটাই হলো নয়া অর্থনীতির কামাল। আদতে কয়লাখনি জাতীয়করণ আইনের মধ্যেই ফাঁক রেখে দেওয়া হয়েছিল যে কয়লার কিছু 'প্যাচ' ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে উৎপাদনের জন্য দেওয়া যেতে পারে। ব্যস, এটাকেই হাতিয়ার করে আউটসোর্সিং-এর বাজার গরম। কোথাও কোথাও তো গোটা উৎপাদনটাই আউটসোর্সিং-এ হচ্ছে। যেমনটি উড়িষ্যার মহানদী কয়লা অঞ্চলে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে গোটা উৎপাদনটাই ঠিকা-শ্রমিকরা করেন।

যদিও কয়লাখনি জাতীয়করণের পরেও কোলিয়ারিগুলিতে বিভিন্ন ধরনের ঠিকাদারি চালু ছিল। কিন্তু সেগুলি সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। নির্মাণকাজের ঠিকা, বালি ভরার ঠিকা, ভূগর্ভের খনিগুলিতে খুঁটি লাগানোর ঠিকা, লাইন পাতার ঠিকা ইত্যাদি এদের মধ্যে প্রধান। ১৯৮০-র দশকে 'চারি কমিটি'র রিপোর্ট হঠাৎ আবিষ্কার করল যে কয়লা শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে গেছে, এবং তাদের বেতনও অনেক বেশি দেওয়া হয়। এগুলিকেই কয়লা শিল্পে লোকসানের কারণ বলা হল। শুধু *বিসিসিএল* ও *ইসিএল*-এই ৫০ হাজার শ্রমিক অতিরিক্ত ঘোষণা করা হল। কিছু বেশি টাকার বিনিময়ে তাদের ছাঁটাইয়ের সুপারিশ করা হল। নাম দেওয়া হল 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক'। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার ঢুকিয়ে রোগের ওষুধ খোঁজা হল। এর প্রথম শিকার হলেন ওয়াগন-লোডাররা, যাঁরা রেল-ওয়াগনগুলোতে কয়লা বোঝাইয়ের কাজ করতেন। এঁদের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই ছিলেন। বাস্তবে তদানীন্তন ভূগর্ভের খনিগুলিতে কয়লা কাটার শ্রমিকের সংখ্যা কম থাকার ফলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছিল না। কর্তৃপক্ষ এটাকে শ্রমিকদের এ্যাবসেন্টিজম্ বলত। এই ঘাটতিকে পূরণ করার জন্য পুরুষ ওয়াগন-লোডারদের সোজাসুজি ভূগর্ভে পাঠানো শুরু হলো। কোনো ঝুটঝামেলা ছাড়াই কয়লা শিল্প থেকে ওয়াগন-লোডার শ্রমিক গায়েব হয়ে গেল এবং মহিলা শ্রমিক উবে গেল। এর বদলে ওয়াগন লোডিং-এর কাজে ঠিকাদান মেশিন (পে-লোডার) নিয়ে এল, যাতে খুব কম সংখ্যক ঠিকা-শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়।

এটা উল্লেখযোগ্য যে সারা দেশে যখন নতুন অর্থনীতি লাগু করা হচ্ছিল, স্থায়ী শ্রমিকরা নিজেদের সুবিধা বা *ভিআরএস*-এর টাকার পরিমাণ বাড়ানোর চক্করে বিনা প্রতিবাদে ঠিকাদারি প্রথাকে স্বীকার করে নিল। পরিণাম হলো, পরবর্তীকালে স্থায়ী শ্রমিকদের সংখ্যাও কমে গেল। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিরও ক্ষমতা ছিল না যে দৃঢ়ভাবে নতুন অর্থনীতির মোকাবিলা করবে। অন্য সব শিল্পের মতো কয়লা শিল্পেও এমনই ঘটলো। কয়লা শিল্পকে লোকসান থেকে বাঁচানোর নামে স্থায়ী শ্রমিকরা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আউটসোর্সিংকে স্বীকার করে নিল। যার পরিণতি আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এমনকি রাণীগঞ্জ কয়লা অঞ্চলে শ্রমিক নেতা হারাধন রায় আউটসোর্সিং-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজের ইউনিয়ন সিটু-র মধ্যেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন।

কোল ব্লক বন্টন

এটা সত্যি যে আশির দশক পর্যন্ত কয়লা শিল্প বিপুল ঘাটতির শিকার ছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮৫-৯০) শেষ অবধি ২৮৫ মিলিয়ন টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রেখে কোল ইন্ডিয়া ১২০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ক'রে ২৫০০০ কোটি টাকা লোকসানে পৌঁছেছিল। ঘাটতির কারণগুলি যথাযথ বিশ্লেষণ না ক'রে কোপটা শ্রমিকদের ওপর নামিয়ে আনা হলো এবং ঠিকাদারদের সংখ্যা বাড়ানো হলো। এই প্রেক্ষিতেই যাত্রা শুরু হলো নতুন অর্থনৈতিক নীতির, যা ইদানীং কোটি কোটি টাকার কোল ব্লক কেলেঙ্কারি নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। আশির দশকে যে দুর্নীতি কোল ইন্ডিয়াকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল এবং লোকসানের প্রধান কারণ ছিল, আজ সেই দুর্নীতি প্রধানমন্ত্রীর অফিস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

১৯৭৩ সালে গঠিত কয়লা খনি জাতীয়করণ আইনে ২৭/৯৫/১৯৭৬-এ সংশোধনী এনে ব্যক্তি মালিকানাধীন ইস্পাত শিল্পের জন্য বরাদ্দ 'কয়লা খনন করার পাট্টা' বাতিল ক'রে তাদের নিজস্ব শিল্পের জন্য নিজস্ব (captive) খনির

ছাড়পত্র দেওয়া হল। শর্ত রাখা হলো, রেল ওয়াগনের মারফত কয়লার পরিবহন করা যাবে না। ১৯৯৩-এ কয়লা খনি জাতীয়করণ আইনে আবার সংশোধন করে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে ক্যাপটিভ কয়লা খনির অনুমতি দেওয়া হল এবং রেল ওয়াগন মারফত কয়লা বহনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হল। ১৯৯৬-এ আনা সংশোধনে এর সাথে যুক্ত হল ব্যক্তি মালিকানাধীন সিমেন্ট শিল্প। এও বলা হল যে সরকারি বা বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির যদি কয়লা উৎপাদনের অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে তারা সরকারি বা বেসরকারি কোম্পানিগুলির সাথে যৌথ উদ্যোগে কয়লা উৎপাদন করতে পারে। অর্থাৎ সরকারি কোম্পানিগুলিতে বেসরকারি কোম্পানিগুলির অনুপ্রবেশের রাস্তা করে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, শতকরা একশো ভাগ বিদেশি বিনিয়োগে চলা বিদ্যুৎ ও ইস্পাত শিল্পের ক্যাপটিভ খনিগুলিতেও বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হল। ৭৪% বিদেশি বিনিয়োগে চলা সিমেন্ট কোম্পানিগুলির ক্যাপটিভ খনিতেও এই একই নীতি অনুসৃত হল। এইভাবে কয়লা উৎপাদনে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রবেশ ঘটলো।

এই ক্যাপটিভ খনিগুলোর জন্যই কোল বন্টন করা হয়েছিল। যার কেলেঙ্কারি আজ বহুচর্চিত। হালে সুপ্রিম কোর্ট গত ১৭ বছরের সমস্ত বন্টন বাতিল করার রায় দিয়েছে। ১৯৯৩ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ২১৮টি কোল ব্লক বন্টন করা হয়েছিল। কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে আসার পর ১৯টি বন্টন বাতিল হয়ে যায়। ২০১১-র মার্চ পর্যন্ত ২৮৯টি সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির কাছে ৪৪.৪৪ বিলিয়ন টন কয়লা ভাণ্ডারের ১৯৪টি কোল ব্লক ছিল। এখন তার সংখ্যা জানা যাচ্ছে ১৯৬টি। এ সমস্তর ওপরেই সুপ্রিম কোর্ট এখন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এদের মধ্যে মাত্র ৯২টি সরকারী কোম্পানী।

কয়লা খনির প্রসারের জন্য পুঁজি বিনিয়োগের অভাব আছে বলে সরকার ব্যক্তি মালিকদের কোল ব্লক বন্টন করল। এই বন্টন কেলেঙ্কারির ফলে সরকারি কোষাগারের ক্ষতির পরিমাণ ১,৮৬,০০০ কোটি টাকা। নিলাম ছাড়া কোল ব্লক বন্টনই শুধু নয়, আরও বড় প্রশ্ন হলো, কয়লার মত মূল্যবান জাতীয় সম্পদ কেন বিপুল পরিমাণে ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হলো? যেখানে সরকারি নীতিই জাতীয় সম্পদকে লুটপাটের রাস্তা করে দিচ্ছে, সেখানে দালালি ও কমিশন খাওয়া কে আটকাবে? বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি!

হাই পাওয়ার কমিটি

স্বাভাবিকভাবেই কয়লা-শিল্পে একদিকে স্থায়ী শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ও অন্যদিকে আউটসোর্সিং-এর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানাধীন কয়লাখনির প্রসার আগামী দিনে ঠিকা শ্রমিকদেরই মুখ্য উৎপাদকের ভূমিকায় এনে দেবে। এটাও স্বাভাবিক যে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষও দিনদিন বাড়বে। দেশের অন্য শিল্পগুলিতে ঠিকা শ্রমিকদের জঙ্গি মনোভাব এটারই সংকেত দিচ্ছে। সম্প্রতি দিনে মহানদী কয়লা অঞ্চলে ঠিকা শ্রমিকদের জঙ্গি আন্দোলন এই ধারণাকে আরও পুষ্ট করে। কেন না এখন থেকেই কয়লাশিল্পের ঠিকা-শ্রমিকদের সীমিত গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা হোক! এর জন্যেই কোল ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি ও পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হাই পাওয়ার কমিটিকে ঠিকা-শ্রমিকদের অভিভাবক হিসাবে খাড়া করে দেওয়া হল। তারা নাকি ঠিকা শ্রমিকদের ভালোমন্দের কথা ভাববে।

এই কমিটি ঠিকা শ্রমিকদের বেতনের সীমা নির্ধারণ করে দিল। এমন সীমা, যাতে কিনা অতি-দক্ষ ঠিকা-শ্রমিকের বেতনও স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতনের চেয়ে কম। স্থায়ী শ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক বেতন বেসিক ৬২০ টাকার সাথে ৩৩.৮% *ভিডিএ* ও ১.৭৯৫% *এসডিএ*। অন্যদিকে অতি-দক্ষ ঠিকা-শ্রমিকের দৈনিক বেতন *ভিডিএ* ও বেসিক মিলিয়ে ৫৯২ টাকা। *ভিডিএ* সময় সময় বাড়লেও বেসিক বাড়বে না। এইভাবে মূল বেতনকে গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলা হলো। প্রচার করা হলো, ঠিকা-শ্রমিকদের বেতন অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই সাথে সুর মেলালেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। তারা নাকি ঠিকা শ্রমিকদের বেতন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আসলে, সম কাজে সম বেতন, যা শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকার— কিছু টাকা বেতন বাড়িয়ে শ্রমিকদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো, বা অন্য ভাষায় বললে, শ্রমিকদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। চালু ভাষায় একেই বলা হয়ে থাকে 'পাইয়ে দেবার রাজনীতি'!

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, যে ঠিকা শ্রমিকদের কোল ইন্ডিয়া নিজের শ্রমিক বলেই মনে করে না, সেই শ্রমিকদের বেতন-মান নির্ধারণের অধিকার তাদের দিল কে? পরম্পরায় চলে আসছে, শ্রম মন্ত্রক ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করে। এখানে শ্রম মন্ত্রক কোল ইন্ডিয়াকে কয়লা শিল্পে ঠিকা-শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ অনুমতি দিয়ে দিল। কোল ইন্ডিয়া সম কাজে সম বেতনের অধিকার নস্যাৎ করে দিয়ে যেমন খুশি বেতন নির্ধারণ করে দিল। এটা কি শ্রম মন্ত্রক ও কোল ইন্ডিয়ার যৌথ চক্রান্ত নয়? যার মধ্যে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতাদের সামিল করে নেওয়া হল! শুধু এটুকুই নয়, যে ঠিকা-শ্রমিকদের বেতন নির্ধারিত করা হলো, তারা কয়লা-শিল্পের স্থায়ীচরিত্রের কাজ করে আসছেন বহুদিন যাবৎ। তাদের স্থায়ীকরণের আইনসম্মত দাবির পথেও স্থায়ীভাবে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। বর্তমান পরিবর্তিত উৎপাদন

প্রণালীর আসল উদ্দেশ্যও এটাই যে মাইনে বা কিছু সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে মৌলিক অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়া, শ্রমিকদের দর কষাকষির নিজস্ব ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেওয়া। বলা যেতে পারে যে 'হাই পাওয়ার কমিটি গঠন ও তার সিদ্ধান্তগুলি নয়া অর্থনীতিরই একটি অঙ্গ। ঘটনা পরম্পরা খতিয়ে দেখলে একটা বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে যে সরকারি নীতিগুলির লক্ষ্য বা অভিমুখ হচ্ছে জাতীয় স্বার্থের কথা বলে শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকদের লুঠপাঠের রাস্তা পরিষ্কার করা, মেহনতি মানুষের মঙ্গল বা তাদের স্বার্থরক্ষা নয়।

বাস্তব অবস্থা হলো, বেশ কিছু জায়গায় ঠিকা-শ্রমিকদের হাজিরা খাতায় নাম অবধি থাকে না এবং তাদের কোনো পরিচয়পত্রও থাকে না। সাধারণভাবে ঠিকা শ্রমিকদের আন্দোলন আরম্ভ হয় হাজিরাখাতায় নাম তোলা ও পরিচয়পত্রের দাবি নিয়ে। ধাপে ধাপে স্থায়ীকরণের দাবী অবধি পৌঁছয়। হাই পাওয়ার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান বেতনমান, বোনাস, চিকিৎসার সুবিধা, ইএসআই, সিএমপিএফ ইত্যাদি লাগু করানোর দাবিতে আপাতত আন্দোলন চলতে থাকবে, যা হোঁচট খাবে স্থায়ীকরণের দাবি তোলার আগে।

সমস্ত শ্রমিকেরই গরিমাময় জীবনযাপন করার স্বপ্ন থাকে। ঠিকা-শ্রমিকরা এই স্বপ্ন দেখেন সম কাজে সম বেতন ও স্থায়ীকরণের দাবি পূরণ হওয়ার মধ্যে। সেটা আজ প্রচণ্ড বাধাপ্রাপ্ত। এই বন্ধনকে ছিন্ন করা ঠিকা-শ্রমিকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে স্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকা-শ্রমিকের যৌথ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। এযাবৎকাল ঠিকা-শ্রমিকদের ব্যবহার করা হত স্থায়ী শ্রমিকদের হরতাল ভাঙার জন্য। অপরদিকে ঠিকা-শ্রমিকদের আন্দোলন ভাঙার জন্য ঠিকাদারের গুন্ডারা যখন আক্রমণ করত, স্থায়ী শ্রমিকরা তখন দূরে দাড়িয়ে তামাশা দেখতেন। আজ সময়ের দাবী এই বিভাজনকে শেষ করা। স্থায়ী শ্রমিকরাও নিজেদের সুযোগ সুবিধা এবং সংখ্যা খুইয়ে পথে দাঁড়ানোর মুখে। ঠিক তেমনই ঠিকা শ্রমিকরাও নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। নয়া অর্থনীতির হামলা উভয়পক্ষকেই শিকার বানিয়েছে। এই নীতির বিরুদ্ধে লড়াই উভয়পক্ষের ঐক্যের দাবি করে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিক আন্দোলনে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে এ লড়াই দেশব্যাপী সমস্ত মেহনতি মানুষের আন্দোলনেরই অঙ্গ। ঠিকা-শ্রমিকদের দেশব্যাপী সমন্বয় ও আন্দোলনই হয়ত আগামী দিনের পথ প্রস্তুত করবে।

ভারত রাষ্ট্রে শ্রম আইন

১৯ পৃষ্ঠার পর

যে মুনাফা করে তার কাছে এই সামান্য ক্ষতিপূরণ নিতান্তই সামান্য। সম্প্রতি ভিলওয়ারা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির ২০১১ সালের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলছে, সমাজে মালিক আর শ্রমিক এক অর্থনৈতিক অবস্থানে নেই, আর মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নানান জটিল আইনি কুটকচালি প্রশ্ন তোলে, যেটি অন্যায়। তাই শ্রম আইনকে শ্রমিকস্বার্থেই সর্বদা ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতের শ্রম আইনের কাঠামোই শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। অর্থাৎ একটা বিষয় পরিষ্কার, ভারতে শ্রমিক স্বার্থে শ্রম আইন রূপায়িত হবে কি হবে না, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ভারত রাষ্ট্রের শ্রম দফতরের ওপর। অথচ ভারতে দেওয়ানি, ফৌজদারি আইনে কিন্তু যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে অপর পক্ষকে তার কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করতে পারে, যেটা শ্রম আইনে সম্ভব নয়।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন সংস্থায় শ্রম আইনের তদারকি সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে শ্রম দফতরের ইন্সপেক্টারদের কাজের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশিকা জারি করে শ্রমিকদরদি সাজার চেষ্টা করছেন কিন্তু শ্রমিকদের মৌলিক দাবি অর্থাৎ মালিকের শ্রম আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে মালিককে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করার অধিকারের প্রশ্নে তিনি আশ্চর্যরকম নীরব। ভারতীয় সংবিধান সৃষ্টির ৬৫ বছর পরও ভারতের সমস্ত নির্বাচিত সরকার আসলে শ্রমিকের বদলে মালিক স্বার্থ রক্ষায় অনেক বেশি সচেতন ও আন্তরিক, যেটি রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করছে। মালিক স্বার্থরক্ষাকারী শ্রম আইনের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে ভারতের কোন সরকারই রাজি নয়।

শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা

1. Workmen's Compensation Act, 1923
2. Trade Union Act, 1926
3. Payment of Wages Act, 1936
4. Industrial Employment Standing Orders Act, 1946
5. Industrial Disputes Act, 1947
6. Factories Act, 1948
7. Minimum Wages Act, 1948
8. ESI Act, 1948
9. EPF Act, 1952
10. Apprentice Act, 1961
11. Contract Labour Act, 1970
12. Payment of Gratuity Act, 1972

প্রবন্ধ

তেজোময় ভারত

দারা-শুকো

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তাদের শিক্ষা-শাখা বিদ্যাভারতীর সুপারিশে জনৈক দীননাথ ব্যাটরাকে দিয়ে ভারত ইতিহাস সংক্রান্ত একটি পাঠ্য-বই লিখিয়েছে, যার নাম *তেজোময় ভারত* এবং যেটি আপাতত গুজরাটের সমস্ত সরকারী মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলে পড়ান হবে, যার সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এই বইটি থেকে কিছু অংশ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজে (২৭ মে ২০১৪) তুলে দেওয়া হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বইটি দাবি করছে যে বেদের যুগে মোটর চালিত রথ ছিল এবং মহাভারতে টেলিভিশন ও স্টেম সেলের উল্লেখ আছে।

এই বইটিকে আমরা এক সর্বব্যাপী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ধরতে পারি যার বাকি অনুপূরক অংশগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাবে। কথা হচ্ছে পরিকল্পনাটি কী? এর উত্তর অবশ্য মার্ক্স আগেই দিয়েছেন যে এ যাবৎ যত সমাজ দেখা গেছে তার (লিখিত) ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। কাজেই এখন আমরা চোখের সামনে যা দেখছি তা হল শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনে ঘটে চলা শ্রেণী সংগ্রামেরই বহিঃপ্রকাশ। বলা বাহুল্য, এ সংগ্রাম আজ শুরু হয়নি। প্রথমে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে সেই চলমান সংগ্রামের ইতিহাসটা দেখে নিই।

ইংল্যান্ডে শ্রেণী সংগ্রামে ধর্মের ভূমিকা

১৬৮৯ সালটি ব্রিটিশ মধ্য-শ্রেণী বা বুর্জোয়াদের কাছে একটি বিজয়ের বছর। এই বছরেরই তারা ব্রিটিশ অ্যারিস্টোক্রাসির বিরুদ্ধে তাদের প্রথম জয়টি ছিনিয়ে নেয় এবং সেটিকে পোক্ত করে একটি নবনির্মিত চুক্তির দ্বারা। এই বছর থেকেই তারা লর্ডদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে ইংল্যান্ডের শাসক শ্রেণীজোটের খুবই মিনমিনে কিন্তু তবুও স্বীকৃত একটি অংশে পরিণত হয়। ক্ষমতা অর্জন করে তারা দেখল, তাদের অধীনে এসে গেছে 'ক্লার্ক, ওয়ার্কপিপল্ ও ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট'-দের নিয়ে গঠিত এক উৎপাদনকারী কর্মীবাহিনী, যাদেরকে আনুগত করে রাখা দরকার। এই নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণীটি নিজেরা ছিল ধার্মিক এবং তাদের বিশেষ ধরণের খ্রিস্টান-ধর্ম, কেলভিন-বাদের ঝাণ্ডার নীচেই তারা লর্ড ও রাজার বিরুদ্ধে লড়েছিল। সেই সময় ইংল্যান্ডে কর্মীবাহিনীর তুলনায় 'স্বভাবত উচ্চতর' বলে অভিহিত এই শ্রেণীটি খুব শিগগিরি 'স্বভাবত নিম্নতর'-দের দমিয়ে রাখার ব্যাপারে ধর্মের গুরুত্বটা বুঝতে পারল, কারণ ধর্মই সেই হাতিয়ার যা সাধারণভাবে আনুগত্য শেখায়।

তাদের ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার আরও একটি কারণ হলো ইংল্যান্ডে বস্তুবাদের প্রসার যা এল থমাস হবসের (১৫৮৮-১৬৭৯) হাত ধরে। যদিও এই বস্তুবাদ চর্চা করত কেবলমাত্র অ্যারিস্টক্রাসি এবং তাদের তুলনায় আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর বুর্জোয়ারা এ ব্যাপারে কোন ভূমিকাই নিতে পারেনি, তবু এই বস্তুবাদী দর্শনের প্রসারের ফলে তারা এর মধ্যে নিজেদের বিপদটা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিল। এই অবস্থায় ঘটল ফরাসী বিপ্লব। এটি ইউরোপে বুর্জোয়াদের তৃতীয় বিপ্লব, কিন্তু এই প্রথমবার সেটা লড়া হল ধর্মের আবরণ ছিন্ন করে দিয়ে খোলাখুলি রাজনৈতিক লাইনে। সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে শুধু রাজনৈতিক-সামরিক নেতৃত্বটাই ইংল্যান্ড বরণ করে নিল না, যেখানে ফরাসী বিপ্লবের রণধ্বনি দাঁড়াল বস্তুবাদ, সেখানে তারা আরও মরিয়া হয়ে তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরল। প্যারির সন্ত্রাসের রাজত্ব কি দেখিয়ে দেয়নি জনগণের ধর্মীয় প্রবণতা লুপ্ত হলে কী কাণ্ড হয়?

বিপদ তাদের পিছু ছাড়েনি। এই সময়েই ঐতিহাসিক কালধর্মে গঠিত হল ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টি, যা ইতিহাসে চার্টিস্ট পার্টি বলে খ্যাত। এবং শুধু নিজেদের সংগঠিত করাই নয়, ১৮২৪ সালেই তারা নিজেদের শক্তির প্রমাণ রাখল এই ঘটনার মাধ্যমে যে ওই বছরেই এক অনিচ্ছুক পার্লামেন্টকে 'combination of workmen'-কে নিষিদ্ধ করে আনা একটি আইনকে বেমালুম গিলে ফেলতে বাধ্য করে।

ঘণ্টা এমনিতেই বেজে গেল এবং গোদের উপর দেখা দিল একের পর এক বিষফোঁড়া। ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর শ্রমিক অভ্যুত্থানে কেঁপে উঠল ইউরোপ। ১৮৪৮-এ বুর্জোয়ারা সব জায়গায় কমিউনিজমের অপচ্ছায়া দেখতে আরম্ভ করল। আঠারশ চল্লিশের দশকে জার্মানিতে শুরু হল খ্রিস্টান ধর্মের ইতিহাস চর্চা, তাতে ওই ধর্মের বস্তুগত ছালছাড়ানো আরম্ভ হল। এবং ইতোমধ্যে বস্তুবাদ রূপ নিয়েছে বিজ্ঞান-চর্চার। লায়েলের কাজে পৃথিবীর ভূতত্ত্বের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবার ফলে ধ্বসে যেতে শুরু করল বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব। আর ডারউইন মানুষের উদ্ভবের ইতিহাসটা মেলে ধরার ফলে খ্রিস্টানধর্মের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেল। ধর্মকে রক্ষা করার শেষ লড়াইতে সামিল হল তারা। এই সময়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন এঙ্গেলস তা দেখা যাক।

যদিও এর আগে থেকেই ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকে যে সাধারণ লোককে ধর্মীয় বাতাবরণে রাখাই শ্রেয়, এইসব ঘটনার পর সে কতটা গভীরভাবে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল? তার কন্টিনেন্টাল স্বগোত্রীয়দের (অর্থাৎ ফরাসী, জার্মান, ডাচ ইত্যাদি

বুর্জোয়ারা, যারা তখনও অবধি নিরীশ্বরবাদ চর্চা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কেবলমাত্র এর পরেই তারা ব্রিটিশদের পথে অনুগমন করে ও অন্তত লোক-দেখানো ভাবে ধর্মীয় রীতিগুলি প্রকাশ্যে পালন করতে থাকে ও ধর্মকে ফিরিয়ে আনে-লেখক) টিটকিরি উপেক্ষা করে সে লক্ষ লক্ষ টাকা, বছরের পর বছর খরচ করতে থাকে; তার দেশীয় ধর্ম-ব্যবসায়ীদের উপর সম্পূর্ণ ভরসা না করে সে *ব্রাদার জোনাথন*-এর (অর্থাৎ আমেরিকার, তৎকালে প্রচলিত নাম-লেখক) সাহায্য চাইল, যারা সে সময় ছিল এযাবৎকাল দেখা সবচেয়ে বৃহৎ ধর্ম-ব্যবসায়ী, ধর্মকে যারা এক সুবিপুল প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়েছিল, এবং আমেরিকা থেকে *ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থান* আমদানি করল, যেমন মুডি ও শ্যাঙ্কি ও তাদের স্বগোত্রদের।

আর্য-সমস্যা

ইংল্যান্ডে যে লড়াই দাঁড়াল খ্রিস্টিয় ধর্মকে রক্ষা করার কাজে, ভারতবর্ষে সেটা কী রূপ নিল তা বোঝার জন্য আমরা প্রথমে কেবল একটা দিককে বেছে নেব। তা হলো আর্য-সমস্যা। কেননা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ভিত্তির একটি হল আর্যবাদ। সে জন্য দীননাথ বাটরা লিখিত *তেজোময় ভারত* থেকে এই সংক্রান্ত একটু অংশ তুলে দেওয়া যাক :

> What we know today as the motorcar existed during the Vedic period. It was called *anashva rath*. Usally a rath (chariot) is pulled by horses but an *anashva rath* means the one that runs without horses or *yantra-rath*, what is today a motorcar. The Rig Veda refers to this...

এমনিতে আর্য ও বেদ সংক্রান্ত সমস্যা যতটা জটিল, ব্রিটিশ কর্তাদের ও অন্যদের বিশেষ জটিল কার্যকলাপের ফলে তা আরও জটিল রূপ ধারণ করেছে। তা যে কেমন, সেটা বোঝার জন্য আমরা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও তথ্যবহুল পুরোনো একটা লেখার খানিকটা অংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি। লেখকের জবানীতে না দিলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে এবং বর্তমান লেখক চৌর্যাপরাধে দায়ী হবেন। পাঠক ধৈর্য ধরে এটি পড়লে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আক্রমণের পরিকল্পনার কেবল একটি দিক বুঝতে পারবেন। এটির লেখক শ্রীননীমাধব চৌধুরী, (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৫৪, পৃ. ৩২৯) :

> সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইউরোপে ভাষা বিজ্ঞানের (Comparative Philology) গবেষণার সূত্রপাত হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ পণ্ডিত স্যর উইলিয়ম জোন্স আবিষ্কার করিলেন যে সংস্কৃতের সহিত গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান তাহা আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে না। (bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammer which could not have been produced by accident...
>
> তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন এক মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত। ("...no philologer could examine all the three without believing them to have sprung from some common source which, perhaps, no longer exists.") তাঁহার আরও ধারণা হইল, যে মূল ভাষা হইতে সংস্কৃত উদ্ভূত হইয়াছে সেই মূল ভাষা হইতে গথিক ও কেল্টিকও উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার পর common source বা মূলভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ভাষা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বপ্ (Bopp) এবং Historical Grammer-এর স্রষ্টা গ্রিম এ সম্বন্ধে গবেষণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনুমিত মূলভাষা পট-এর (Pott) হাতে ইন্দো-জারমেনিক নাম পাইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিল। পট-এর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর (১৮৩৩-৩৬) জার্মানীতে বৈদিক ও আবেস্তিক ভাষাতত্ত্বের গবেষণার জোয়ার আসিল। জার্মেনী ও ফ্রান্সে ও অন্যত্র বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত আপনাদিগের গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিক গবেষণা সম্বন্ধে Rosen, Roth, Benfy, Kuhn, Aufrecht-এর নাম পণ্ডিত সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। তারপর প্রকাশিত হইল আগাস্ট শ্লেইসারের (August Schleicher) বিখ্যাত গ্রন্থ (১৮৬১)। শ্লেইসার গবেষণা করিয়া মূল ভাষার একটা কাঠামো (reconstruction of the pre-historic parent speech) খাড়া করিয়া দিলেন।
>
> এই মূলভাষা ও তাহা হইতে যে সকল ইউরোপীয় ও এশিয়াটিক ভাষার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয়ান বা ইন্দো-জার্মেনিক ভাষাগোষ্ঠী। Aryan নামটি ইংল্যান্ডে বেশী প্রচলিত, দ্বিতীয় মতটি ফরাসী ও আমেরিকান পণ্ডিত মহলে ও তৃতীয় মতটি জার্মানীতে প্রচলিত।
>
> **মূল আর্যভাষা**
>
> মূলভাষা যখন একটি ছিল তখন এই ভাষাভাষী জাতিও একটি অবশ্য ছিল (the great original Aryan tribe)। মূল ভাষাকে যারা আর্য নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের মত এই যে তা থেকে উদ্ভূত সবগুলি ভাষা যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহারা সকলে আর্যবংশধর। এর পর আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণের ("Our Aryan forefathers") আদিবাসভূমি কোথায় ছিল, কী ভাবে কখন তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়েন সে সম্বন্ধে গবেষণা

আরম্ভ হইল। Philology কেমন করিয়া Ethnology'র পথে পা বাড়াইল তা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে। এইভাবে ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণা হইতে জাতি সৃষ্টি হইল। যে সকল বাধাবিঘ্ন যথেষ্ট বৈজ্ঞানিকমনা ভাষা-বিজ্ঞানীকে নিরস্ত করিয়া রাখিত, উৎসাহী, একাধারে ফিলোলজিস্ট ও এথনোলজিস্টদিগকে তাহা ঠেকাইতে পারে নাই। আর্য- ভাষাগোষ্ঠী হইতে আর্য পূর্বপুরুষ, ক্রমে Aryan race, Aryan nationality ("Europe may boast of being the mother of Aryan nationality"-Schrader-এর মত দ্রষ্টব্য), Aryan Brotherhood প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য-পূর্বপুরুষগণের ধর্ম, সমাজব্যবস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য- সমূহ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে।

...এক দল পণ্ডিতের এই প্রকার উদ্যম হইতে রাজনৈতিক আর্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। উপরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিসন্ধিমূলক ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে। পলিটিক্যাল আর্যবাদ ইহার দৃষ্টান্ত। ইহার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে জার্মেনীতে। এই ইতিহাস সুপরিচিত।....

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে রপ্তানীর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ইউরোপীয় আর্যবাদ যখন এদেশে প্রথম প্রচারিত হইল, কৃষ্ণকায় ভারতীয় হিন্দুগণ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল যে তাহারা তাহাদের বিজেতা জাতির সমগোত্রীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বেচ্ছায় তাঁহারা লৌহ-শৃঙ্খল ধারণ করিয়াছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর Aryan Brotherhood-এর মতবাদ এই শৃঙ্খলের ক্ষতের উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ লেপন করিল। তার পর হইতে ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী বৈদেশিক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচার করিতেছেন ভারতীয় হিন্দুর নাক, মুখ, মাথা, সবই ইউরোপীয় আর্যের, শুধু ত্বকের কৃষ্ণত্বটুকু আসিয়াছে climatic conditions হইতে। ইহা ব্যঙ্গ বা অতিরঞ্জন নহে, প্রকৃত ঘটনা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার নাম প্রোটো-নর্ডিক থিওরী।"

এর পর ননীবাবু আর্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত জানাচ্ছেন :

প্রথম কথা এই যে পূর্বের কয়েকটি আলোচনা হইতে এই সূত্র পাওয়া গিয়াছে যে আর্যপদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই ভৌগোলিক অঞ্চল আইরিয়ানা বা আরিয়ানা। এই আইরিয়ানা বা আরিয়ানা হইতে ঋগ্বেদের আর্যপদ আসিয়াছে, এবং আবেস্তার আইরিয়াও বা আরিয় পদ আসিয়াছে। পরবর্তীকালে এই আইরিয়ানা হইতে আইরান বা ইরান নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে একটু সতর্ক হইতে হইবে। আধুনিক পারস্য বা ইরানের যে ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ পশ্চিমে কুর্দীস্থান হইতে পূর্বে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত যে মালভূমির নাম ইরান দেওয়া হয়, তা প্রাচীন আইরিয়ানার সীমানা নহে। ইরাণীয় গোষ্ঠীর ভাষার ইতিহাস, প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মের ইতিহাস এবং আবেস্তার সাক্ষ্য ইহার প্রমাণ। ...যে আইরিয়ানা হইতে আর্য নামটি আসিয়াছে তাহা ভৌগোলিকগণের পূর্ব-ইরাণও নহে। এই আইরিয়ানার কেন্দ্রস্থল হিন্দুকুশ—ইহার একটি নাম Indian Caucasus— পশ্চিমে খোরাসান, দক্ষিণে শতদ্রি, উত্তর-পূর্বে পামীর উপত্যকা ও উত্তর পশ্চিমে সুগাধা ও মৌরু, ইহার এরূপ সীমানা নির্দেশ করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে ধর্মীয় ভাব রপ্তানী

ননীমাধব বাবুর কথা এখানেই শেষ। এই লেখাটির প্রত্যেকটি অংশই আমরা গ্রহণ করতে বলছি না। কিন্তু প্রথমত লক্ষ্য করতে বলি এই কথাটা যে 'ভারতবর্ষে রপ্তানী করার জন্য বিশেষ তত্ত্ব রচনা করা হয়'। বস্তুত ইংল্যান্ডে যে শ্রেণীটি গভীর অধ্যবসায় সহকারে বছরের পর বছর টাকা খরচ করে ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা ভারতেও যাতে রেনেসাঁ ও এনসাইক্লোপিডিয়া উদ্ভূত 'র‍্যাশনাল ও সেকুলার' চিন্তার বিপরীতে ধর্মীয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য অন্য অনেক ব্যবস্থাই করেছিল এবং অনেক ভাবধারা তথা ব্যক্তিকেই এখানে রপ্তানি করেছিল। সেই অংশটা বিস্তৃত করে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধু এইটুকু বলে নেওয়া ভাল সে প্রচেষ্টায় প্রধান ভূমিকা কারা কারা পালন করেছে।

১) ফ্রেডেরিক ম্যাক্সমূলার; ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে বেদ অনুবাদ করা তথা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আদান প্রদানের মাধ্যমে। তিনি রামমোহন রায় থেকে শুরু করে কেশবচন্দ্র সেন অবধি অনেকের জীবনী লিখেছেন। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ-র জীবনী দুটি, একটি তাকে পাশ্চাত্যে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য ও অন্যটি তার মৃত্যুর পরে। অন্য গবেষক লক্ষ্য করেছেন, ম্যাক্সমূলারের "'ভারতবাসী আর্যজাতির বংশধর' এই উক্তির পর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'আর্যামির আস্ফালন' দেখা দিয়েছিল।" (উনিশ শতকের নব্য হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক—সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী)। ম্যাক্সমূলারের নিজের অবস্থান ছিল বিজ্ঞানের বিপরীতে, ধর্মের দিকে। তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে ভারতে একটি ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানের জন্য জীবনের শেষ দিন অবধি অপেক্ষা করে গেছেন।

২) অগস্ট কোঁৎ-এর ভাবধারা এখানে ছড়িয়ে দিয়ে। সুনীতিকুমার রায়চৌধুরী লিখছেন, "উল্লেখ্য যে, যোগেশচন্দ্র

ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারপন্থী, এমনকি বঙ্গিমচন্দ্রও কোঁৎ অনুরাগী ছিলেন। এর কারণ আছে, কোঁৎ-এর অধিকার ভেদ, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সংস্কার, পঞ্জিকা পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ক মতবাদ হিন্দুধর্মের সঙ্গে মেলে। ...কোঁৎ বিবাহকে যেভাবে তিনভাবে ভাগ করেছেন, তার সঙ্গে মনুর যথেষ্ট মিল আছে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও বিশ্বাস ভেঙ্গে দিতে চাননি বলে তিনি এমন কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেছিলেন যার সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বাসের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়।"

৩) কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কি'র 'থিওজফি' আন্দোলন এখানে চালান করে। এরা ছিলেন একেবারে এঙ্গেলস বর্ণিত 'আমেরিকান ধর্ম ব্যবসায়ী'। প্ল্যানচেটে আত্মা নামানো আদি যাবতীয় আমেরিকান ছক্কাবাজির মাধ্যমে তারা এখানে জনমানসে জায়গা করে নিয়েছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র তার 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন "থিওসফি আসিয়া সদ্য চেতনাপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজের চক্ষুরুন্মীলন করে।" (উনিশ শতক-আলোক রায়, পৃ. ১৪৭)। সুনীতিরঞ্জন রায়চৌধুরী লিখেছেন, "উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফলে যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে দেখা দিয়েছিল, 'থিওসফি' আন্দোলন তা ব্যাহত করে। ভারতীয় রাজনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলনও 'থিওসফিস্ট'-দের দ্বারা আংশিক প্রভাবিত হয়ে সংস্কার বিমুখ সঙ্কীর্ণ হিন্দু-জাতীয়তাবাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা অ্যানি বেসান্ত প্রথম জীবনের প্রগতিশীল ভাবধারা বিসর্জন দিয়ে মাদাম ব্লাভাট্স্কির শিষ্যা হয়েছিলেন (১৮৮৯)।"

এই অংশটি বিস্তৃত অধ্যয়য়ের দাবি রাখে। খুব সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হল এইজন্য যে এই পুনরুভ্যুত্থানবাদী পরিবেশেই ১৯২৪ সালে *আরএসএস*-র জন্ম, তা মনে রাখা হবে।

বৈদিক-জন

তবে সে আলোচনায় এখন না গিয়ে আপাতত আমরা বৈদিক-জনেদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

বেদ চর্চার একজন মান্য পণ্ডিত এএ ম্যাকডোনেল, তাঁর ১৯২৭ সালে লেখা, *India's Past* বইতে জানাচ্ছেন,

> We are able to infer safely from the evidence of earliest phase of Indian literature that in remote prehistoric time certain warlike tribes invaded India from the north-east, and gradually spreading first to the east and then to the south, subjugated the aborigins and imposed their speech and their civilization on almost the entire country.

এখানে আমরা যে শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তা হল 'ট্রাইব্স'। যদিও এই শব্দটির দ্বারা কোন জনগোষ্ঠীর একটা বিশেষ সংস্কৃতিগত মানকে বোঝায় না, কেননা ঐ একই সমাজ-সংগঠনের মধ্যে থেকে মানবগোষ্ঠীগুলি আদি বন্য দশা থেকে উচ্চ-বর্বর দশা অবধি কাল অতিবাহিত করেছে, তবুও অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই সংস্কৃতির মানের একটা সীমা আছে, এবং প্রয়োজন-চালিত সেই সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি মোটর গাড়ি তৈরি সম্ভব? কিন্তু বৈদিক-জনদের সমাজবৈশিষ্ট্য নির্ধারণে মাকডোনেল একাই নন, বা আদিও নন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তার ও যুক্তিবাদের ভগীরথ রামমোহন রায়ও ঐ একই ভাষায়, ট্রাইব শব্দটি ব্যবহার করে ইতিহাসকে বিধৃত করেছেন। আসুন সে অংশটা আমরা একটু দেখে নিই :

> At an early age of civilization, when the division into castes was first introduced among the inhabitants of India, the second tribe, who were appointed to defend and rule the country, having adopted arbitrary and despotic practices, the others revolted against them; and under the personal command of the celebrated Parasuram, defeated the royalists in several battles, and put cruelly to death almost all the males of that tribe. It was at last resolved that the legislative authority should be confined to the first class who could have no share in the actual government of the state, or in managing the revenue of the country under any pretence; while the second tribe should exercise the executive authority. (Brief remarks regarding modern encroachment on the ancient rights of the females-এর ফুটনোট)

এবারে দেখা যাক, আধুনিক গবেষকরা কী বলছেন—

> ব্যবহারিক সংস্কৃতির দিক দিয়ে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা নবাগত আর্যদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সংগ্রামে জয়লাভ করে আর্যরা যখন এই সংস্কৃতির বাতাবরণে বসতি স্থাপন করলেন, তখন দৈনন্দিন সান্নিধ্য ও পারস্পরিক বিবাহসূত্রে আদিম লোকজীবনের অনেক উপাদানই তাঁরা আত্মস্থ করে নিলেন। তাই মৃৎকুটিরবাসী আর্যরা যদিও কয়েক শতাব্দীর জন্য নিজেদের জীবন ধারা সম্পর্কে কোন পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ রেখে যাননি, কিছুকাল পরেই কিন্তু গৃহ ও মৃৎপাত্র নির্মাণে তাঁরা যে প্রাথমিক

প্রয়াস শুরু করেছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু উপাদানগত বিচারে শ্রেষ্ঠতর সংস্কৃতির প্রভাব যাযাবর ও পশুপালক আর্যদের উপর কীভাবে সর্বাত্মক হয়ে উঠেছিল তার কোন নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। (সুকুমারী ভট্টাচার্য : ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, পৃ. ৫)

'যাযাবর ও পশুপালক', যারা মৃৎপাত্র গড়তে জানত না, তারা মোটর গাড়ি তৈরী করবে?

এবারে আসা যাক, আমাদের শ্রদ্ধেয় গবেষক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়–

নিঘণ্টু-মতে পৃথিবী-বাচক একটি শব্দ হল 'গো'—গরু। সায়ণও স্থানবিশেষে 'গো' শব্দ পৃথিবী অর্থে গ্রহণ করেছেন। আবার নিঘণ্টু-মতে 'অদিতি' শব্দ পৃথিবী-বাচক এবং গো-বাচক, দুইই। তেমনি 'ইলা' মানে পৃথিবী, গো, বাক্ এবং অন্ন।

এ-জাতীয় শব্দ-ব্যবহার থেকেই অনুমান হয়, বৈদিক কবিদের কল্পনা ছিল একান্তই গো-বিভোর বা গো-ময়। গরুই তাঁদের কাছে সব-কিছু, যেন পুরো পৃথিবী। ...জনৈক কবি এমনকি বৈদিক দেবতাদেরও ''গো-জাতঃ'' বলে বর্ণনা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এবং স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যেও সহস্র গরুকেই উপর উপর দাঁড় করাবার পরিকল্পনা দেখা যায়।

আরো নজিরের বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বস্তুত, আধুনিক বিদ্বানেরা বারবার মন্তব্য করেছেন— এবং সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়েই তার সমর্থন আছে— যে যাঁরা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলতই পশুপালক; তাঁরা এমনকি ভাল করে কৃষিকাজও শেখেন নি; ধনসম্পদ বলতে তাঁদের কাছে প্রধানতই পশু, যদিও অবশ্য—বিশেষত পরবর্তী পর্যায়ে—যুদ্ধে-জিত অন্যান্য সম্পদও। (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *ভারতীয় দর্শন*, পৃ. ১৩৩-)

আরো একটা ব্যাপার দেবীপ্রসাদ বলেছেন, যে প্রথম ঋক থেকে শেষ ঋক রচনার মধ্যে বহু শত বছরের ব্যবধান এবং প্রথম ঋক থেকে উপনিষদ রচনার মধ্যে কয়েক সহস্র বছরের ব্যবধান! আর ম্যাকডোনেল জানাচ্ছেন এই কালের মধ্যে বৈদিক জনেদের ধর্ম কীভাবে আবর্তিত হয়েছে।

It may be said that the religion embodied in the *Rigveda* is a more important subject of study for the investigation of the history of religion than the religion of any other sacred book; for here we see the development of mythology and religion from the most primitive to an advanced stage, and gods coming into being before our very eyes : a transition from the animistic to the polytheistic stage, from that in which natural phenomenon are thought to be possessed of a soul like living beings to one in which they are personified, deifed, anthromorphised as a polytheistic group, which is finally unified in a pantheistic sense. We see deification in all its phase, from the beginning to the end of the scale.

অর্থাৎ এই সময়কালের মধ্যেই আদি ম্যাজিক বিশ্বাস থেকে উত্তরণ হচ্ছে ধর্মে, কারণ আদি সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে যাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে অসাম্য। যদিও এখানে একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা দরকার যে, সাম্যবাদী 'জেনটাইল' (গোত্র) সমাজ ভেঙ্গে এখানে প্রাচীন গ্রীস, রোম বা মধ্যযুগীয় জার্মেনিক জনগোষ্ঠীর মত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উৎপত্তি হয়নি, হয়েছে জাত-বর্ণ প্রথায় বিশ্লিষ্ট এক সমাজের উদ্ভব, যে বৈশিষ্ট্যকে দেবীপ্রসাদ-ই চিহ্নিত করেছেন 'incomplete detribalisation' বলে। সেইটিকেই মার্কস বর্ণনা করেছেন 'Asiatic Mode of Production' বলে এবং যেটি সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র করে চর্চার বিষয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের কাছে জিজ্ঞাস্য, *তেজোময় ভারতের* ১১৮ পৃষ্ঠায় যে লেখা হয়েছে, (*ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* অনুযায়ী), ''It is better to die for one's religion. An alien religion is source of sorrow.''— তা, কোন সময়ের ধর্মে আমরা আশ্রয় নেব বা ফিরে যাব? বৈদিকজনেদেরই তো লম্বা ইতিহাস, তার উপর আছে সিন্ধু-জনেরা। কোনটা আমরা গ্রহণ করব?

তেজোময় ভারত থেকে আর একটু উদ্ধৃতি দিই—

We should not demean ourselves by calling our beloved Bharatbhoomi by the shudra (lowly) name 'India'. What right had the British to change the name of this country?....We should not fall for this conspiracy and forget the soul of our country (p. 53)

কেন? ভারতের নাম ইন্ডিয়া হলে, আমাদের আপত্তির কী থাকতে পারে? যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ভারত নামটি যে রাজা ভরত-এর থেকে এসেছে, তিনি আর্য ছিলেন, তাহলেও আমাদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই বা আপত্তি করারও কিছু নেই। আবার ইন্ডিয়া নামটি এসেছে সিন্ধু নদেরই বৈদেশিক উচ্চারণ 'ইন্ডাস' থেকে, যেমন মেগাস্থিনিসের বইটির নাম 'ইন্ডিকা'। তাহলে *আরএসএস*-এর এত ভয়ঙ্কর আপত্তি কেন?

কারণ এইটা যেমন স্বীকৃত যে, আর্যরা এই ভৌগোলিক

অঞ্চলে বসবাস করতে করতে জনগঠনে একটি ধারা হিসাবে কাজ করেছে, তেমনই সিন্ধু-জনেরাও ভারত সংস্কৃতি গঠনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। ব্যথাটা এই জায়গায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একথাটা ভুলিয়ে দিতে চায় তথা অস্বীকার করতে চায় যে অন্য ধারার মানুষেরাও ভারত সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা পালন করেছে। 'শূদ্র' ও 'নিচু' শব্দদুটিকে একার্থে ব্যবহার করার মধ্যে একটা গোপন কারবার আছে। তাদের প্রচারের মধ্যে এই গোপন ধারা রয়েছে যে সিন্ধু-জনেদের কথা একদমই না তোলা। ভারত ইতিহাস গঠনে তাদের যে একটা উজ্জ্বল ভূমিকা আছে, সেটা এড়িয়ে যাওয়া। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ইরফান হাবিবের মত লোকও এমনভাবে ইতিহাস রচনা করছেন যে তাতেও একই ভ্রান্তির অবকাশ থাকছে। প্রথমে দেখা যাক, ইরফান হাবিব কী বলছেন।

সিন্ধু সভ্যতার অবসান

সিন্ধু সভ্যতার অবসানের প্রহর তার আবির্ভাবের মতোই প্রহেলিকাময়। এর পূর্ববর্তী প্রাচীন সিন্ধু সংস্কৃতির মধ্যে যেমন এর অতীব প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের কোনো পূর্বাভাস বা নজির দেখতে পাওয়া যায় না, বস্তুত তেমনি শেষ প্রহরে এর অনেক বৈশিষ্ট্য একইরকম আকস্মিকতায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছিল। প্রথমে শহর এবং নগরীর কথা : ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরেই তাদের আর দেখা গেল না। ...রাস্তা এবং নালিসংক্রান্ত শহর পরিকল্পনার কোন কিছুই পরবর্তী বসতিতে চোখে পড়ে না। হাতে গোনা দু'একটি স্থানে পোড়া ইট দেখতে পাওয়া যায়। সীলে খোদিত লিপি এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রের নকশা অতি দ্রুত বিরল হয়ে গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হারিয়ে গেল সিন্ধু লিপি। সেই সঙ্গে সীল এবং প্রস্তরফলকে খোদিত পবিত্র প্রাণী এবং দেবমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। ...পোড়ামাটি বিশিষ্ট মূর্তিগুলি, বিশেষ করে এদের মধ্যে 'মাতৃদেবী' মূর্তি, আর দেখতে পাওয়া গেল না। সমাধিস্থ করার রীতি-রেওয়াজেও সুস্পষ্ট পার্থক্য নজরে পড়ে। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, এর থেকে এমন অনুমান করা যায়। কিছু কিছু কারিগরি-বিদ্যা, যেমন স্টিয়াটাইট-কাটা কিংবা পাথরের দ্রব্যাদি প্রস্তুতি বা সচেতনভাবে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী করা, এ সবই ক্রমশ বিলীয়মান হয়ে গেল কিংবা চিরতরে হারিয়ে গেল। সিন্ধু বাটখারা আর ব্যবহারই হত না। শেষ পর্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সিন্ধু মৃৎশিল্পের স্থান অধিকার করে নিল অন্য আঙ্গিকের শিল্পদ্রব্য; সাধারণভাবে এগুলি একটু অমসৃণ ধাঁচের।

অতএব অন্য একটি অনাগরিক পরিবেশ এবং নিরক্ষতায় সমাপতিত হয়ে অবশেষে এই পরিবর্তনের পালা সাঙ্গ হল। ধর্মের ঠাঁইবদল হল আর গুণ ও পরিমাণ উভয়ক্ষেত্রেই হস্তশিল্পের বিপুল সংকোচন ঘটল। সিন্ধু সভ্যতা থেকে পরবর্তী উত্তরাধিকারে কেবল নগণ্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রের সামগ্রী টিকে রইল আর এমনকি তারাও বেশ দ্রুততায় দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গেল। (সিন্ধু সভ্যতা, ইরফান হাবিব, পৃ. ৬৭-৬৮ এন বি এ, ২০০৪)

এর উপর আমরা কেবল দু-একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যই করব। মধ্য-ভারতে ডোকরাদের মধ্যে কাঁসা পিতলের কারবার কি আমরা বর্তমানেও অব্যাহত দেখি না? তবে কি সেই ঐতিহ্যকে সিন্ধু সংস্কৃতির বাইরে তৃতীয় আর এক ধারা বলে ধরে নেব, যা সিন্ধু-সংস্কৃতি ব্যতিরেকেই গড়ে উঠেছিল? আর নগর নির্মানের কথা যদি ওঠে, তবে সিন্ধু নগর নির্মাণ প্রণালীর সঙ্গে রামায়ণে অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা এবং তার সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নগর নির্মাণ বর্ণনা অদ্ভুত ভাবে মেলে। সে কি কেবল আপতিক? আমরা এবারে অতুল সুরের বক্তব্য তুলে ধরব।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আমি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা স্যর জন মার্শাল কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলাম 'হিন্দুসভ্যতার গঠনে প্রাগার্যদের দান' সম্বন্ধে অনুশীলন করাবার জন্য। ১৯২৯-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দকালে আমি এই অনুশীলন চালিয়ে প্রমাণ করি যে হিন্দুসভ্যতার গঠনের মূলে বারো আনা হচ্ছে প্রাগার্য উপাদান, আর মাত্র চার আনা ভাগ আর্যসভ্যতার আবরণে মণ্ডিত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান কালচারেল কনফারেন্সে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন— "হিন্দুসভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভুত এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যর জন মার্শল, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।" ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ড. নীহাররঞ্জন রায় যখন তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রকাশ করেন, তখন তিনি এই মতবাদই ব্যক্ত করেন।

আমার অনুশীলনের প্রতিবেদনে আমি বলেছিলাম যে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস; মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা; বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি; প্রকৃতির সৃজন শক্তিকে মাতৃরূপে পূজা; শিব ও লিঙ্গ পূজা; কুমারী পূজা; অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ পূজা; সর্প পূজা; টটেম প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা; দেবদেবীর বাহনের কল্পনা; জন্তু পূজা; গ্রাম; নদী; বৃক্ষ অরণ্য; পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা; মানুষের ব্যধি ও দুর্ঘটনা সমুহ দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংগঠিত হয় বলে বিশ্বাস; বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে লোকাচার; নবপত্রিকা পূজা; শবরোৎব; নবান্ন; পৌষপার্বণ; হোলি; ঘেটু পূজা; চড়ক গাজন; মনসা, শীতলা, কালী, করালী,

ছিন্নমস্তা, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা; দেবতাদের জন্য মন্দির নির্মান; চিত্রাঙ্কন ও লিখন-প্রণালী; দশাবতারবাদ প্রভৃতি আমাদের প্রাগার্যদের কাছ থেকেই নেওয়া।

যদিও অতুলকৃষ্ণ সুর জোরটা দিয়েছেন ধর্ম ও সংস্কারের ওপর তবুও মন্দির নির্মাণ ও লিখন-প্রণালীর কথাটা লক্ষ্য করার মত। মহাভারত যে গণেশ লিখেছিল এবং সেখানে যে উল্লেখ আছে যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ করতে ময়দানবকে ডাকা হয়েছিল, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদি সিন্ধু সভ্যতার নগর ধ্বংসের কাল ও মহাভারতের কালের মধ্যে পাঁচশো বছরের ব্যবধান ধরি, তাহলে কি এই সিদ্ধান্তেই পৌছে যাই না যে, এই পাঁচশো বছর ওই বিদ্যাগুলি সমানে প্রবাহিত হয়ে আসছিল? এবং, আরও, এ ঘটনা কি ইঙ্গিত করে না, কর্ম-ভিত্তিক জাতি প্রথা সিন্ধুজনেদের কাল থেকেই রূপ পেয়েছে? বস্তুত, শহর-ভিত্তিক সভ্যতা যারা গড়েছিল, তাদের পক্ষেই তো কর্ম-বিভাগ করা সম্ভবপর, তাই নয় কি?

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারের আর একটা দিক হলো প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করা যে আর্যরা বহিরাগত নয়। ইরফান হাবিব উল্লেখ করেছেন আমাদের দেশের ঐতিহাসিকদের একটা অংশ নব্বই-য়ের দশক থেকেই এইটা প্রমাণ করতে সক্রিয়। এর কারণ কী? কারণ *আরএসএস*-এর বক্তব্য হলো আমাদের নিজেদের ধর্মই পালন করা উচিত। ইঙ্গিতটা ইসলামের দিকে, অর্থাৎ সেটা বহিরাগত। কাজেই যদি এটা প্রমাণ না করা যায় যে আর্যরা স্থানীয় তবে আরব বা তুর্করা যখন আসছে, ইতিহাসের ঘটনাক্রমে ততদিনে যারা একটা বিশেষ ধর্মকে অবলম্বন করেছে, তাদের ধর্মকে বহিরাগত বলে অভিযুক্ত করা যাবে না। সেই কারণেই একদল ঐতিহাসিক সমানে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে, আর্যরা বহিরাগত নয়। এব্যাপারে আমাদের মতটা বলা যাক। যদি মানব সমাজের ইতিহাস আমরা অনুধাবন করি, তবে দেখা যায়, সুদূর বন্য অবস্থা থেকেই মানবগোষ্ঠীগুলি বিরাট বিরাট পরিভ্রমণ করেছে এবং এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে চলে গেছে। বস্তুত, স্থায়ী বসবাস মানবগোষ্ঠীর অনেক পরের ব্যাপার। দেখা যাচ্ছে, এমনকি সিন্ধু সভ্যতা বিস্তারের আগে থেকেই বর্তমান ভারতের চৌহদ্দি থেকে শুরু করে সুদূর আরব অবধি অব্যাহত যোগাযোগ ছিল। সেই অবস্থায় কোন মানবগোষ্ঠী বা বণিকগোষ্ঠী, কালানুযায়ী যা প্রযোজ্য হবে, যদি ভারতের বাইরে থেকে এসে থাকে, তবে সেটা সে সময়ের পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক। আরও একটা কথা। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, তার শব্দচয়নের ক্ষেত্রে যেমন শ্রেণীস্বার্থের ভূমিকা আছে, আছে জাতীয়তাবাদের মত ভাবধারার উপাদান, তেমনি আছে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কালানৌচিত্যের প্রয়োগ। যেমন, বর্তমান ক্ষেত্রে, 'আর্যরা বহিরাগত' একথা বলা হলে, বাহিরটা কী? আজকের ইরাক থেকে আজকের পাকিস্তানে যাওয়া মানে একটা রাজনৈতিক সীমানা লঙ্ঘন, কিন্তু খিস্ট পূর্ব ৩০০০ সালে উরুক-এর (বর্তমান ইরাক) বণিকেরা যখন কোট-দিজি (বর্তমান পাকিস্তান)-তে বা আম্রি-নাল-এ (বর্তমান বেলুচিস্তান) বা শাহর-ই সোকতা নগরে (বর্তমান ইরানে) আসত, তখন কি তারা বলত, ইরাক থেকে ইরান বা পাকিস্তানে যাচ্ছি, বা পাসপোর্ট-ভিসার বন্দোবস্ত করত? ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন যুগে প্রাচ্যে বণিকরা সর্বত্র সদাই স্বাগত ছিল, সে রোমানরা ভারতে হোক, কি ভারতীয়রা ইন্দোনেশিয়াতে হোক বা ভাস্কো-ডা-গামার প্রতি কালিকটের জামরিনের আতিথেয়তা হোক, যদিও ভাস্কো সে আতিথেয়তার জবাব দিয়েছিলেন কালিকট বন্দরে গোলা বর্ষণ করে। আর একটা কথা। 'ভারতের' বলতে কী বোঝায়? ১৯৪৭ সালের আগে বা পরে ভারতের ভৌগোলিক সীমানা তো এক নয়। প্রাচীন কালে কী ছিল? অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁর 'হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন' বইতে কাব্যধর্মী ভাষায় বলেছেন, ভারতের নৃপতিরা তক্ষশিলার দুর্গপ্রাকারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখতেন, শত্রু আসছে কিনা। তক্ষশিলা অর্থাৎ কাবুল। আবার, যখন আমাদের ইতিহাসে লেখা হয়, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আমরা বসতি স্থাপন করেছিলাম, তখন সেটা ভারত-গরিমা বলে মনে হয়, কিন্তু যারা এই কাজটি করেছিলেন, সেই চোলরা কি নিজেদের ভারতীয় বলত? ইতিহাসে বহু পরে যা হয়েছে, তা আগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এক ভয়ঙ্কর রোগ। কাজেই, যদি কোন মানবগোষ্ঠী সেই অতীতে প্রয়োজনের তাগিদে এখনকার ভারত/পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমায় এসে থাকেন, সেটা সে সময় অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এ বিষয়ে এখনকার জনগণের কী বলার থাকতে পারে, কেবল ঐতিহাসিক কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া? এ বিষয়ে কোন পক্ষ অবলম্বনের চেষ্টা সময় ও অর্থের অপচয় বৈ আর কিছু নয় এবং একমাত্র দুরভিসন্ধিই তার উদ্দেশ্য হতে পারে।

রাষ্ট্রিয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অনেকেই ফ্যাসিবাদী বলে অভিহিত করেছেন। ফ্যাসিবাদের ভিত্তির একটি স্তম্ভ হল বৌদ্ধিক স্তরে অতিকথা ও মিথ্যার সৃষ্টি করা। আমাদের কাজ হলো সেই মিথ্যাবরণকে চূর্ণ করা। জ্ঞানের নির্মল আলোকে সত্যের স্বরূপ উম্মোচিত হোক। ১৮২১ সালে যখন অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল নেপলসের স্বাধীনতাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিল তখন রামমোহন রায় সেই সংবাদে মর্মাহত হয়ে 'ক্যালকাটা জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক জেমস সিল্ক বাকিংহামকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন, আসুন, আমরাও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি, "Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful." এইটিই হোক আমাদের রণধ্বনি।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতে কৃষি-সম্পর্কের পরিবর্তন

প্রণব দে

গত ৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে কলকাতায় ভারতসভা কক্ষে শহীদ সরোজ দত্ত জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। কিছু পরিবর্ধন করে সেই নিবন্ধটি মুদ্রিত হলো।

১৯৬৭ সালের মে মাসে উত্তরবঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামে যে ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূত্রপাত, তা ছিল এক ভাগচাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কাহিনী। বিগুল কিষাণ নিজের ভাগজমির দখল নিতে গিয়ে জোতদার ঈশ্বর তিরকির গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং তারই প্রতিবাদে জন্ম নিল যুগান্তকারী এক কৃষক বিদ্রোহ। অন্ধ্র থেকে বিহার, পাঞ্জাব থেকে আসাম— ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে দেখা দিয়েছিল এক অভূতপূর্ব কৃষক জাগরণ, যার রেশ এখনো মুছে যায়নি।

যে দুটি রাজ্যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উন্মেষ ঘটেছিল, প্রায় দুই দশক আগে সেই দুটি অঞ্চল বিখ্যাত দুটি কৃষক অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করেছিল। অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা এবং স্বাধীনোত্তর পর্যায়ে অন্ধ্র প্রদেশে তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন। বস্তুত, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের থেকেও প্রাচীন এবং খুঁটিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে, কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা দ্বিধার কারণেই, ভারত খণ্ডিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষেও কৃষকের লড়াই অব্যাহত। কেবল বিদেশি শাসকদের জায়গা নিয়েছে দেশীয় শাসকশ্রেণী, কিন্তু দেশি-বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষককে বাঁচতে হচ্ছে।

দুই

তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি— ব্যবধান দুই দশক হলেও এই আন্দোলনগুলির মধ্যে এক যোগসূত্র আছে। লড়াইটা ছিল ঔপনিবেশিক ভারতের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার অবশেষের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের কৃষিজোতের বৃহদাংশ, ৫৭ শতাংশে ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি ব্যবস্থার বিস্তার। ৩৮ শতাংশ ছিল (মূলত দক্ষিণ ভারতে) রায়তোয়ারি বন্দোবস্তের অধীন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে মোটামুটি ৫ শতাংশ অঞ্চলে বিরাজিত ছিল মহলওয়ারি বন্দোবস্ত। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভূমিব্যবস্থা পত্তনে বৃটিশদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই— রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা। ‘‘কোনো জমিদারি খামার ছাড়াই জমিদারের জমির মালিকানা ভারতের কৃষিব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেশির ভাগ ভারতীয় জমিদারের জমির মালিকানা থাকলেও খামারের উপকরণের মালিকানা ছিল না, ছিল শুধু সামন্ত বা আধা-সামন্ত উপাধি আর তারই জোরে প্রাক-পুঁজিবাদী ভাগচাষী প্রজাদের কাছ থেকে জমির খাজনা নিতেন। প্রায় সমস্ত জমিই ছোট ছোট ভাগে কৃষকদের কাছে লিজ দেওয়া হত।” (*দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তকালীন ভারতের কৃষিব্যবস্থা*- রস্তিস্লাভ উলিয়ানভস্কি)। কৃষকরা সরাসরি জমিদারদের থেকে জমি পেত না। জমিদার এবং মূল কৃষক প্রজার মাঝে থাকতো অনেক মধ্যস্বত্বাধিকারী। কৃষক প্রজা ছিল মূলত মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্যই ছিল খাজনা প্রদায়ী প্রজা বন্দোবস্ত। তবে চিরস্থায়ী এলাকার বাইরেও, রায়তোয়ারী এবং মহালওয়ারী এলাকাতেও এই প্রথা বিস্তার লাভ করেছিল। ‘‘Nonetheless, informal intermediaries of the *zamindari* type emerged even in areas where the *ryotwari* (and *mahalwari*) systems had strongholds. While some *raiyats* were owner-cultivators, many rented out part or all of their land to tenants, mostly sharecroppers.”(*Improving Land Access to Indian Poor*-Tim Hanstad-RDI)। স্বাধীনতার সময়ে ভারতবর্ষে সমগ্র কৃষিজোতের অর্ধাংশ ছিল এইরূপ প্রজাস্বত্ব জোত (Tenancy)।

তিন

নকশালবাড়ি আন্দোলন যখন হয়, তখন ভারত তিন-তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্ব অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু ভারতের ভূমি-ব্যবস্থার চরিত্রে তা নজরকাড়া কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। জমিদারি-জায়গিরদারি প্রথা বিলোপকারী আইনগুলি বলবৎ হয়েছে। কাগজে-কলমে জমিদারি গেলেও, অধিকাংশ জমির দখলদারি তখনও জোতদার বা বৃহৎ ভূস্বামীদের হাতে। বর্তমান নিবন্ধে শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তি জোত বা কৃষিজমির মালিকানা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা কৃষিজোতের যে রকম শ্রেণী বিভাজন করেছে, এই প্রবন্ধে সেটাই অনুসরণ করা হয়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার শ্রেণী বিভাজন নিম্নরূপ—

প্রান্তিক কৃষক	১ হেক্টর পর্যন্ত জমি
ক্ষুদ্র কৃষক	১ হেঃ অধিক- ২ হেঃ
আধা-মধ্য কৃষক	২ হেঃ অধিক- ৪ হেঃ
মধ্য কৃষক	৪ হেঃ অধিক- ১০ হেঃ
বৃহৎ কৃষক	১০ হেঃ অধিক

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (Household Ownership Holdings in India, 59th Round, 2003) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সালে ২.৮৫ শতাংশ বৃহৎ ভূস্বামীর হাতে ছিল

২৮.২৫ শতাংশ জমি এবং ৬৬.০৬ শতাংশ প্রান্তিক চাষী ভোগ করত মাত্র ৭.৫৯ শতাংশ কৃষিজমি। ১৯৭০-৭১ সালে এই অনুপাতের সামান্য হেরফের হয়েছিল— সমগ্র কৃষিজমির ২২.৯১ শতাংশের মালিক ছিল ২.১২ শতাংশ বৃহৎ ভূস্বামী, প্রান্তিক ৬২.৬২ শতাংশ কৃষকদের দখলে ছিল মাত্র ৯.৭৬ শতাংশ জমি। সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল ক্ষুদ্র কৃষকের। ষাটের দশকে সংখ্যাগত ভাবে ৯.১৬ শতাংশ (জমি ১২.৩৯%) থেকে ১৯৭০-৭১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৫.৪৯ শতাংশ (জমি ১৪.৬৮%)। কৃষকের বৃদ্ধি ছিল ৬.৩৩ শতাংশ, কিন্তু অধিকৃত জমি বেড়েছিল মাত্র ২.২৯ শতাংশ। মধ্যবর্তী কৃষকের সংখ্যা এবং তাদের জমির পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল ।

শ্রেণী	সাল	পরিবার (%)	বৃদ্ধি	জমি (%)	বৃদ্ধি
বৃহৎ ভূস্বামী	১৯৬১	২.৮৫		২৮.২৫	
	১৯৭১	২.১২	-০.৭৩	২২.৯১	-৫.৩৪
মধ্য	১৯৬১	০৯.০৭		৩১.২৩	
	১৯৭১	০৭.৮৩	-১.২৪	৩০.৭৩	-০.৫০
আধা-মধ্য	১৯৬১	১২.৮৬		২০.৫৪	
	১৯৭১	১১.৯৪	-০.৯২	২১.৯২	১.৩৮
ক্ষুদ্র	১৯৬১	০৯.১৬		১২.৩৯	
	১৯৭১	১৫.৪৯	০৬.৩৩	১৪.৬৮	-২.২৯
প্রান্তিক চাষী	১৯৬১	৬৬.০৬		০৭.৫৯	
	১৯৭১	৬২.৬২	-৩.৪৪	০৯.৭৬	২.১৭

সংক্ষেপে নকশালবাড়ির প্রাক্কালে, বৃহৎ ভূস্বামীরা দখল করতো ভারতের কৃষিজমির ২৩ শতাংশ, মধ্য কৃষকরা ৫৩ শতাংশ, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা মাত্র ২৪ শতাংশ।

একদিকে কৃষিজমির কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের বিপুল সমাবেশ, এই দ্বন্দ্ব ছিল ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় ভূমিহীন যে সংজ্ঞা আছে, তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন অনেকেই। ০.০০২ হেক্টরের কম (০.০০৫ একর বা ৬০০ বর্গফুটের কম) জমি থাকলে নমুনা সমীক্ষায় ভূমিহীন দিসাবে গণ্য করা দয়। কিন্তু নমুনা সমীক্ষার তথ্যানুসারে, এক একরের (০.৪ হেক্টর) কম জমি যাদের আছে, তাদের ৯০ শতাংশ জমি বাস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এক একরের কম জমি থাকলে, তা কৃষিজমি বা উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়না। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, কৃষিজমি প্রাপ্তির নিরিখে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে এক একরের কম জমি-মালিকদের প্রকৃত ভূমিহীন হিসাবে বিচার করতে হবে। (*Relations of Production and Modes of Surplus Extraction in India*, Amit Basole and Deepankar Basu)। দুটি হিসাবের মধ্যে বিস্তর হেরফের। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে এক একরের কম জমি সম্পন্ন পরিবার ছিল ৪৪.২১ শতাংশ। যেখানে, নমুনা সমীক্ষার বিচারে ভূমিহীন পরিবার ছিল মাত্র ১১.৬৮ শতাংশ। ১৯৭০-৭১ সালে উক্ত দুই অনুপাত দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৪৪.৮৭ শতাংশ এবং ৯.৬৪ শতাংশ।

জমিদারি/মধ্যস্বত্ব বিলোপের সাথে সাথে কৃষক- প্রজাদেরই জমির মালিক বা রায়ত হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। ''জাতীয় নমুনা সমীক্ষা গোপন প্রজাবিলি জমির সঠিক হদিস দিতে পারেনা, এটা ধরে নিয়েও, বর্তমান হিসাব অনুযায়ী, প্রজাবিলি জমি, মোট কর্ষিত জমির ১৫ শতাংশের বেশি নয়। স্বাধীনতার সময়ে, প্রায় অর্ধেক পরিমাণ প্রজাস্বত্ব জমি খুব ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পরিণত হয়েছে। মোট কর্ষিত জমির মাত্র চার শতাংশে প্রজারা মালিকানা স্বত্ব অর্জন করেছে।" (P S Appu, Quoted from Tenancy Reforms vs open market leasing by Dr N C Saxena, Planning Commission)। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর ৩৫ শতাংশ জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ হয়েছিল এবং যারা তাদের দখল টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তাদের এক ক্ষুদ্রাংশ (৪ শতাংশ) আইনত রায়তি স্বত্ব অর্জন করতে পেরেছিল। কৃষক উচ্ছেদ ইতিহাসের এ এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চার

১৯৬১-এর আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের প্রায় ২৪ শতাংশ (২৩.৫৬ শতাংশ) কৃষিভূমি ছিল ভাগচাষের অধীন (পি এস আপ্পু)। বিহারের মতো কোনো কোনো রাজ্যে, সরকারি তথ্য অনুযায়ী ভাগচাষ অন্তর্ভুক্ত কৃষিজমি ছিল প্রায় ৩৭ শতাংশ। ভাগচাষী বা বর্গাদার যদিও ভূস্বামীর থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করতো, কিন্তু বর্গাদারদের প্রজাস্বত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর একটি ক্ষেত্রে সাধারণ প্রজার সঙ্গে বর্গাদারের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান ছিল। উৎপন্ন ফসলের ভাগ দিয়ে বর্গাদারদের খাজনা মেটাতে হতো। একটা সময়ে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, অবিভক্ত বাংলায় বর্গাদারদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার জোরদার দাবি উঠেছিল। কিন্তু অভিজাত-ভূস্বামীদের চাপে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৮ সালে আইন করে বর্গাদারদের প্রজাস্বত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। উচ্ছেদের আশঙ্কায় নিয়ত চরম নিরাপত্তাহীন জীবন ভাগচাষী-বর্গাদারদের। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সরকার যে 'বর্গাদার আইন' (West Bengal Bargadars Act 1950) করেছিল, তাতে না ছিল তেভাগার দাবির কোনো প্রতিফলন না ছিল সুরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের এই অবস্থানকে অমিত ভাদুড়ি মহাশয় (১৯৭২ সালে) আধা-সামন্ততান্ত্রিক হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, ''শিল্প পুঁজিবাদের তুলনায় বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক ভূস্বামী-ভূমিদাস-এর মতো ধ্রুপদী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে অনেক বেশি সমিল। " (This term 'semi-feudalism' is used

here to convey that the existing relations of production have more in common with classical feudalism of the master-serf type than with industrial capitalism– *A Study in Agricultural Backwardness Under Semi-Feudalism*, Amit Bhaduri)। সামন্ততন্ত্রের উপাদান হিসাবে তিনি চারটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছিলেন— ক) ভাগচাষ প্রথা, খ) ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণগ্রস্থতা, গ) ভূস্বামীদের মহাজনী চরিত্র এবং ঘ) ক্ষুদ্র কৃষকদের বাজারে অনধিগম্যতা। চাষের দায়িত্ব কৃষকের। মূলধন, সার, বীজের জন্য তাকে ঋণ করতে হয়। জমি-মালিক চড়া সুদে ঋণের যোগান দেয়। উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ ঋণ শোধ করতে ব্যয় হয়। এই দুষ্টচক্রে কৃষকের জীবন নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। স্বাধীন কৃষকের স্বাধীনতা আর থাকলো কোথায়? নমুনা সমীক্ষায় হয়তো সর্বাঙ্গীন চিত্র পরিস্ফুট হয়না, তবু ৪৮-তম রাউণ্ডের (Debt and Investment Survey, 1992) রিপোর্ট হয়তো পরিস্থিতি বুঝতে কিছুটা সাহায্য করবে। ১৯৬১ সালে মোট অন্তর্দেশীয় ঋণের (১৯৫৬ কোটি টাকা), ৮৫ শতাংশ বহন করতো গ্রামের কৃষকরা (১৬৭০ কোটি টাকা)। ১৯৭১ সালে মোট ঋণের (৩৮৪৮ কোটি টাকা) ৮৮ শতাংশ (৩৩৭৪ কোটি টাকা) কৃষকদের কাঁধে চেপেছিল। ৬৮ শতাংশ ঋণ ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক (২৬০০ কোটি টাকা) অর্থাৎ মহাজন, ভূস্বামী ইত্যাদিরা ছিল ঋণের উৎস।

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের গরিষ্ঠাংশ তপশিলি জাতিভুক্ত। কৃষিশ্রমিকদেরও এক বৃহৎ অংশ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের। সুতরাং অর্থনৈতিক শোষণ এবং ভূস্বামী-ভাগচাষী দ্বন্দ্ব অনেক সময়েই জাতিগত নিপীড়ন এবং জাত-পাতের দ্বন্দ্ব হিসাবে প্রতিভাত হতো। অস্বীকার করার উপায় নেই, সত্তর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন জাত-পাতের উর্ধ্বে কৃষকদের শ্রেণীগত অবস্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছিল।

পাঁচ

নকশালবাড়ি থেকে নন্দীগ্রাম— কৃষকদের মরীয়া সংগ্রাম ভিন্ন রাষ্ট্র তাদের দিকে দৃষ্টি ফেরায় নি। রক্ত-ঝরা পথেই কৃষককে বরাবর অধিকার অর্জনের পথে সামিল হতে হয়েছে। সারা দেশে সর্বাত্মক রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে সত্তর দশকের কৃষক সংগ্রাম রাষ্ট্রশক্তি নির্মম পথে দমন করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনই ভারতের শাসকশ্রেণীকে কৃষক সমস্যার প্রতি কিছুটা সজাগ দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য করেছিল। ভূমি সংস্কার সম্পর্কে শাসকশ্রেণী উৎসাহ দেখাতে শুরু করে। কিন্তু সেই উৎসাহ সীমাবদ্ধ ছিল পরিকল্পনা স্তরে। গ্রামীণ কায়েমি স্বার্থের বিরোধিতা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারি স্তরে গাফিলতি পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করতে বাধ্য হন। যত জমি উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা ছিল, বাস্তবে লব্ধ উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের Committee on State Agrarian Relations and Unfinished Task in Land Reforms 2008-এর হিসাবে ভারতে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ হওয়া উচিত ৪ কোটি একর। বাস্তবে পাওয়া গেছে ৭০ লক্ষ একরেরও কম। ভূমি সংস্কারের অন্যান্য দিক, বণ্টন, সমবায়করণ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য প্রদান— এ সবকিছুই অবহেলিত অথবা দায়সারা ভাবে সম্পাদিত। ১৯৭৩ সালে পরিকল্পনা কমিশনের তরফে গঠিত টাস্ক ফোর্স মন্তব্য করে যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই ভূমি সংস্কারে অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। "Enactment of progressive measures of land reform and their efficient implementation call for hard political decisions and effective political support, direction and control. In the context of the socio-econmic conditions prevailing in the rural areas of the country, no tangible progress can be expected in the field of land reform in the absence of the requisite political will. The sad truth is that this crucial factor has been wanting." *Report of the Task Force on Agrarian Relations- Two Decades of Land Reform- A Brief Review*, 1973।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা বস্তুটা তো আইন করে আমদানি করা যায়না। সেটা শাসকদের শ্রেণী চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে সাম্রাজ্যবাদ পোষিত সামন্ত-অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে পঙ্গু বুর্জেয়া শ্রেণীর এক স্বাভাবিক মিত্রতা ছিল। এইখানেই চীনের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য। চীনের ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সর্বপ্রকার অবসান ঘটিয়ে উৎপাদিকা শক্তির মুক্তি। ভারতের শাসক শ্রেণীর পক্ষে সামন্ততন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব ছিলনা। সরকার নিজেই উদ্বৃত্ত জমির যা হিসাব দিয়েছিল, তার মাত্র ১৪ শতাংশ উদ্ধার করতে পেরেছে। শ্রেণী মৈত্রী তথা রাজনৈতিক যোগসাজশ না থাকলে জমি কি লুকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল? আপোসটা শুধু সামন্ত-ভূস্বামীদের সঙ্গে নয়, সামন্ত সংস্কৃতির সঙ্গেও রাষ্ট্র আপোস করেছিল। নইলে রণবীর সেনা গড়ে ওঠে কী করে আর ব্রহ্মেশ্বর সিং রাষ্ট্রীয় আদালতে বেকসুর হয় কোন সুবাদে?

আর একটা বিষয় নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই, কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং স্বাধীনতাকামী দেশগুলিকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে সাম্রাজ্যবাদ সীমিত ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট শাসকদের পরামর্শও দিত। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সদস্য এবং পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাঙ্কের উপদেষ্টা উলফ লাদেজেনস্কি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই নেহেরু সরকারের প্রশংসা করে গেছেন। ফলত এইসব কারণে এদেশে যা হয়েছিল, তা এক ধরণের সীমিত সংস্কার, যা

কিছুদিনের মধ্যেই গতি হারিয়ে শুষ্ক খাতে পরিণত হয়েছিল।

সত্তরের দশকে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের প্রসার ভারতীয় কৃষক সমাজের গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তনের সূচনা করে। উচ্চ ফলনশীল বীজে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের খরচও অনেকটাই বেড়ে যায়। সার, জল, কীটনাশক ইত্যাদিতে খরচ সাবেক কৃষির তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারও বাড়তে থাকে। ক্ষুদ্র কৃষক যন্ত্রের জন্য, সেচের জলের জন্য, মূলধন যোগানের জন্য ধনী কৃষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ধনী কৃষক, যাদের পুঁজির জোর আছে, কৃষি উৎপাদন পরিচালনায় তাদের ভূমিকার গুরুত্ব বাড়ে। ভাগচাষ বন্দোবস্তের বদলে কৃষিতে পুঁজি বিনিয়েগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ‘‘The proportion of area held under tenancy, specially pure tenancy, has declined because the land has been resumed by owners for self cultivation. This resumption of farming induced by technological change and impelled by tenancy legislation. This explains rise in concentration of operational holdings because small and marginal farmers still lease in more area than they lease out and large holdings lease out more area than they lease in.” (Hanumantha Rao and Gulati, EPW, 1994 quoted by Saxena)। লক্ষণীয়, আমরা যাদের মধ্য কৃষক বলি, এই পর্যায়ে তাদের হাতে জমির পরিমাণ বেড়েছে। সিলিং আইন চালু হওয়ার ফলে বড়ো জোতের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু তাদের জমির পরিমাণ অতি দ্রুত হারে কমেছে। (পূর্বোক্ত, NSSO, 2003)

সাল	মধ্য কৃষক (৫-২৫ একর)		প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক (৫ একরের কম)	
	পরিবার (%)	জমি (%)	পরিবার (%)	জমি (%)
১৯৭১	১৯.৭৭	৫২.৬৫	৭৮.১১	২৪.৪৪
১৯৮২	১৭.২৩	৫৩.৪১	৮১.৩৪	২৮.৭১
১৯৯২	১৩.৮২	৫০.৬৫	৮৫.৩০	৩৫.৫২
২০০৩	৯.০০	৪৫.০৬	৯০.৪০	৪৩.৪৩

নমুনা সমীক্ষার (Land and Livestock Holdings Survey, 48th Round,1992) তথ্য থেকে কৃষিজমির কেন্দ্রীভবনের যে চিত্রটা পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ-

জোত	কর্ষিত জোতের শতাংশ			
	৬১-৬২	৭১-৭২	৮১-৮২	৯১-৯২
সর্বনিম্ন ৩০ শতাংশ	৪.৬	৪.৪	২.২	৩.০
সর্বনিম্ন ৬০ শতাংশ	১৮.৩	১৮.৬	১৪.৯	১৪.২
সর্ব্বোচ্চ ১০ শতাংশ	৪৬.০	৪৫.০	৪৭.২	৪৭.৬
সর্ব্বোচ্চ ৫ শতাংশ	৩০.৫	৩০.৬	৩২.৪	৩৩.৬

এই দীর্ঘ তিন দশকে জমির কেন্দ্রীভবনের মাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। বরং দেখা যাচ্ছে, নিম্নতম স্তরে জমির পরিমাণ কমছে। এটা হচ্ছে বিশ্বায়ন-পূর্ব চিত্র। বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্যায়ে যে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা জমি-কেন্দ্রীভবনের জিনি সহগের (Gini’s coefficient) মান থেকে অনুমান করা যায়।

বিগত চার দশকে জিনি সহগের মান— ১৯৭১- ০.৭১, ১৯৮২- ০.৭১, ১৯৯২- ০.৭১, ২০০৩- ০.৭৪। স্পষ্টত নব্বই দশকের পর জিনি সহগের মান পূর্ববর্তী দশকগুলির তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বৈষম্য বৃদ্ধির সূচক।

তবে ভারতে কৃষির বিকাশ যে সুষম, এটা বলা যায় না। পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে জমির কেন্দ্রীভবন ভারতের গড় হারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহারেও পাঞ্জাব, হরিয়ানা অন্যান্য রাজ্যকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে। প্রতি হাজার হেক্টরে ভারতে ট্রাক্টর ব্যবহার গড়ে ২১টি (২০০১)। পাঞ্জাবে ও হরিয়ানায় অনুপাতটি যথাক্রমে ১০২ এবং ৯৩। পাম্পসেট ব্যবহারে তামিলানাড়ু অন্যান্য রাজ্যকে পিছনে ফেলে দিয়েছে (১০০০ হেক্টর পিছু ৩২৩)। সামগ্রিকভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের প্রশ্নে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে অনেকটাই এগিয়ে আছে (সূত্র- *Indian Agriculture since Independence*- G S Bhalla)। মোটের উপর ভারতবর্ষে কৃষিতে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু বিকাশ অসম। অঞ্চলভেদে তারতম্য বিস্তর।

ছয়

তথ্যগতভাবে ভাগচাষের এলাকা কমেছে। ভারতের মোট কর্ষিত জমির ৬.৫ শতাংশ বর্তমানে ভাগচাষের অধীন। রাজ্যভেদে ৩-১৭ শতাংশ (Some Aspects of Operational Land Holdings in India, 59th Round, 2002-03)। ভাগচাষের আধিক্য সব থেকে বেশি পাঞ্জাব (১৬.৮৩ শতাংশ কর্ষিত জমি) এবং হরিয়ানা (১৪.৪০ শতাংশ) অঞ্চলেই। বিহার এবং উরিষ্যাতেও যথাক্রমে ১১.৭৪ ও ১৩ শতাংশ কৃষিজমি ভাগচাষের অধীন। তফাৎ হচ্ছে, পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় বৃহৎ জোতে (২ হেঃ - ২০ হেঃ) ভাগচাষের প্রাধান্য দেখা যায়— ২০-২৬ শতাংশ লীজে নেওয়া জমি। অপরদিকে বিহার বা উরিষ্যায় ভাগচাষ সীমাবদ্ধ ০.৪ থেকে ৪ হেক্টরের মধ্যে। পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় সম্পন্ন কৃষকদের জমি লীজ নেওয়ার প্রবণতা রিভার্স টেনান্সির ইঙ্গিত দেয়। তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখন ৯.২৯ শতাংশ জমিতে বর্গাদারি বা ভাগচাষ প্রথা চলছে। এখানেও বড়ো জোতগুলিতে ভাগচাষের আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও রিভার্স টেনান্সি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি বৃহৎ জোতদাররা লীজ নেওয়ার প্রক্রিয়াকে রিভার্স টেনান্সি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিজ জমি চাষ করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা এবং বিপরীতে বৃহৎ জোত

সৃষ্টির প্রবণতা রিভার্স টেনান্সির ব্যাপ্তি ঘটায়। রিভার্স টেনান্সি কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের সহায়ক। বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যে রাজ্যে ভূমি আইনগুলি সংশোধন হয়ে কৃষিজমি লীজ নেওয়ার পথ আরও সুগম করে দিচ্ছে।

সাত

ভারতে আশির দশক পর্যন্ত খেতমজুর বৃদ্ধির হার কৃষক বৃদ্ধির হারের থেকে কম ছিল। ব্যতিক্রম '৬০-এর দশক, যখন উচ্ছেদ ও সবুজ বিপ্লবের দাপটে সংখ্যাগতভাবে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পায়। কৃষক পরিণত হয়েছিল ভূমিহীন মজুরে। '৭০-এর দশকে নকশালবাড়ি এবং কৃষক আন্দোলনের চাপে সরকারি পদক্ষেপে কৃষিক্ষেত্রে কিছুটা ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আশির দশকের পর থেকে অতি দ্রুতহারে খেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি শুরু হয়। কৃষক বৃদ্ধির হার কমতে থাকে এবং বর্তমান শতাব্দীতে কৃষকের সংখ্যা আবার হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

কৃষক ও খেতমজুর (কোটি)

বছর	*কৃষক*	*বৃদ্ধি*	*খেতমজুর*	*বৃদ্ধি*
১৯৫১	৬.৯৯	-	২.৭৩	-
১৯৬১	৯.৯৬	৪২.৫	৩.১৫	১৫.৪
১৯৭১	৭.৮২	-২১.৫	৪.৭৫	৫০.৮
১৯৮১	৯.২৫	১৮.৩	৫.৫৫	১৬.৮
১৯৯১	১১.০৭	১৯.৭	৭.৪৬	৩৪.৪
২০০১	১২.৭৩	১৫.০	১০.৬৮	৪৩.২
২০১১	১১.৮৭	-৬.৮	১৪.৪৩	৩৫.১

সূত্র- সেন্সাস তথ্য

কৃষিতে কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাবে, পুঁজি বিনিয়োগের হার যত বৃদ্ধি পাবে, ক্ষুদ্র কৃষকের ভূমিকা ততই হ্রাস পাবে, ভূমিহীন কৃষক দিন দিন সংখ্যায় বাড়বে।

আট

ভারতের অর্ধেক কৃষক ঋণগ্রস্থ। বিশেষত মহাজনী ঋণের দাপটে ক্ষুদ্র চাষীর নিরুপায় আত্মহত্যা এখন প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা।

কতকগুলি তথ্যের দিকে চোখ রাখা যাক (সূত্র: Indebtedness of Farmer Households, NSSO, 59th Round, 2003) :

১) ভারতের গ্রামীণ পরিবারের ৬০.৪ শতাংশ কৃষক পরিবার (৮.৯৩ কোটি)

২) ৪৮.৬ শতাংশ (৪.৩৪ কোটি) কৃষক পরিবার ঋণগ্রস্থ,

২) অন্ধ্রে ঋণগ্রস্থতার মাত্রা সবথেকে বেশি। কৃষিজীবী পরিবারের ৮২ শতাংশই ঋণগ্রস্থ। তামিলনাড়ুতে এই হার ৭৪.৫%, পাঞ্জাবে ৬৫.৪, কেরালায় ৬৪.৪, কর্ণাটকে ৬১.৬, মহারাষ্ট্রে ৫৪.৮, হরিয়ানায় ৫৩.১, রাজস্থানে ৫২.৪, গুজরাটে ৫১.৯, মধ্যপ্রদেশে ৫০.৮, পশ্চিমবঙ্গে ৫০.১ শতাংশ। অন্যান্য রাজ্যে ১৮ থেকে ৫০ শতাংশ।

৩) ঋণগ্রস্থ পরিবারগুলির ৬২ শতাংশ প্রান্তিক কৃষক পরিবার, ১৯ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক, ১৩ শতাংশ নিম্ন-মধ্য কৃষক।

৪) প্রান্তিক কৃষকদের ৪১ শতাংশের ঋণের উৎস পেশাদার কুসীদ ব্যবসায়ী ও মহাজন, ২৪ শতাংশের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, ১২ শতাংশের ক্ষেত্রে সমবায়, ৩ শতাংশের ক্ষেত্রে সরকার। জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার অংশগ্রহণের অনুপাতও বৃদ্ধি পেয়েছে। অতি-প্রান্তিকদের প্রায় ৫০ শতাংশই মহাজন-ব্যবসায়ীদের কবলে।

প্রান্তিকতার নিম্নসীমায় যাদের অবস্থান, সেইসব পরিবারের পারিবারিক বা চিকিৎসা খাতে ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি, মূলধন খাতে কম। কিন্তু অন্যান্য বর্গের কৃষকদের মূলধনী খাতে ব্যয়ের জন্য বেশি ধার-কর্জ করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এই ঋণের জন্য এখনও মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়।

বিভিন্ন খাতে কৃষক ঋণের অংশ (শতাংশ)

জমির পরিমাণ (হেঃ)	*উৎপাদন*	*ব্যবসা*	*অন্যান্য*
০.০১-এর কম	২০.৮	৭.৭	৭১.৬
০.০১-০.৪০	২২.৮	১২.৩	৬৪.৯
০.৪০-১.০০	৪৬.৮	১০.৩	৪২.৯
১.০১-২.০০	৬৪.৬	৪.৬	৩০.৮
২.০১-৪.০০	৭৩.৫	৪.৭	২১.৮
৪.০১-১০.০০	৮০.৯	২.৩	১৬.৭
১০-এর বেশি	৭৮.২	৩.২	১৮.৬
একত্রে	৫৮.৪	৬.৭	৩৪.৮

নয়

সরকারি তথ্য বলছে, ২০০১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত প্রায় ২.৫ লক্ষ কৃষক (২,২৬,২৯৮) আত্মহত্যা করেছে। কর্পোরেট পুঁজির তত্ত্বাবধানে আধুনিক উন্নয়নের প্রতিযোগিতা যে রাজ্যগুলিতে বেশি, সেই রাজ্যগুলিতে কৃষক আত্মহত্যার হারও বেশি। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রদেশ, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য কৃষক আত্মহত্যার নিরিখে সর্বোচ্চ স্থানগুলি দখল করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সরকারি হিসাবে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ১২৮৬৮। বাৎসরিক গড় ছিল ১০৭২। (২০১২ থেকে পশ্চিমবঙ্গ এই সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া বন্ধ করেছে। ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রেও ২০১১ সাল থেকে পরিসংখ্যান অমিল।) কৃষক আত্মহত্যার সঙ্গে কৃষি ঋণগ্রস্থতার সম্পর্ক উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সংবাদপত্রে চোখ রাখলেই দেখা যাবে, ঋণ শোধ করার অক্ষমতাই আত্মহননের প্রধান কারণ।

ভারতে ১৯৭০-৭১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল হেক্টর পিছু ৮৭২ কেজি। ২০১০-১১ সালে তা হয়েছে ১৯৩১ কেজি/হেঃ। খাদ্যশস্য উৎপাদন ১০৮ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৫ মিঃ টন। কাজেই উৎপাদনে ঘাটতি নেই। তবু

কৃষক যদি ঋণ পরিশোধ করার মতো উদ্বৃত্ত অর্থ অর্জন করতে না পারে, তার একমাত্র কারণ উৎপাদন খরচের তুলনায় পণ্যের দামের ক্ষেত্রে ঘাটতি। শ্রমিক যেমন নিজের শ্রমের মূল্য নিজে ধার্য করতে পারেনা, সেটা নির্ধারণ করে পুঁজিপতি, কৃষকের ক্ষেত্রে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এমন এক মধ্যবর্তী শ্রেণী অথবা ধনী কৃষক, যারা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের চাপে রেখে উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে। এবং সেটা সম্ভব হতে পারে সামগ্রিক ভাবে কৃষি ঋণ এবং কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষকের ক্ষুদ্র পুঁজি বিপন্ন হলে রাষ্ট্র মাথা ঘামাবার ফুরসৎ পায়না, কিন্তু বৃহৎ পুঁজিকে সাহায্য দানে রাষ্ট্রের কার্পণ্য দেখা যায়না।

উন্নত দেশগুলিতে (OECD ভুক্ত) সরকার বৃহৎ কৃষিখামারের মালিকদের বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকতে সাহায্য করে। তুলনামূলক বিচারে ভারতে কৃষকরা (এবং অবশ্যই ধনী কৃষকরা) যে সাহায্য পেয়ে থাকেন, তার পরিমাণ নগণ্য। ১৯৯৯ সালে, আমেরিকায় কৃষক পিছু ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২১০০০ ডলার, জাপানে ২৬০০০ ডলার, কানাডায় ৯০০০ ডলার, ইওরোপে ১৭০০০ ডলার, *ওইসিডি* দেশগুলিতে ১১০০০ ডলার, ভারতে ৬৬ ডলার (ভারত সরকার, কৃষিদপ্তর)। উন্নত দেশগুলির চাপে ভারতের কৃষি যে কতটা ন্যুব্জ, এই তথ্য তার অন্যতম প্রমাণ।

দশ

ভারতের কৃষি জগতে এই মুহূর্তে সবথেকে বড়ো বিপদ কর্পোরেট তথা বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ। বীজ-সার নিয়ন্ত্রণ, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজি একদিকে যেমন ক্ষুদ্র পুঁজিকে গ্রাস করতে উদ্যত অপরদিকে তেমন কৃষিজমি ধ্বংস করে কৃষিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্নকারীর ভূমিকায় আবির্ভূত। আধুনিক এই উন্নয়ন যজ্ঞে আগামী এক দশকে ভারতবর্ষের মোট কৃষিজমির ১৩.৪ শতাংশ এবং ভারতের মোট জমির প্রায় ৮ শতাংশ আহুতি দিতে হবে। গত দুই দশকে ২৭.৬ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে। কৃষিজমি, কৌমভূমি, জলাজমি, অরণ্যভূমির সমস্তটাই যাবে কর্পোরেট শক্তির হাতে।

আর তিন বছর বাদে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হবে। এই অর্ধশতাব্দী কালে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। জল-জমি-জঙ্গল, সবই এখন পুঁজির গ্রাসে। বিশ্বব্যাঙ্কের বিশ্বায়নের নয়া অর্থনীতির সঙ্গে সমন্বয় করে সরকারের এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ জমিকে খোলা বাজারের সম্পত্তিতে পরিণত করার দিকে। ফলত ভূমি সংস্কার এখন ব্রাত্য। তার স্থান নিয়েছে NREGP-র মতো কিছু প্রকল্প। সেটাও করতে সরকার বাধ্য হয়েছে কারণ কৃষিজমি অধিগ্রহণ গ্রামাঞ্চলে যে কর্মসঙ্কোচন ঘটাতে শুরু করেছিল, তার মোকাবিলায় সরকারের পক্ষে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। বিজেপি সরকার এই সামান্য সংস্কারগুলিও বাতিলের উদ্যোগ নিচ্ছে।

সামগ্রিক ভাবে এ সঙ্কটের মূল শিকার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক। রাষ্ট্রই এখন তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। কর্পোরেট কৃষি নীতি এবং মহাজনী ঋণ-জাল, এ থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র তাদের নির্মাণকর্মী হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রাখছে না।

হুইলটাকে ঘোরাতে আবার কি একটা নকশালবাড়ি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?

স্মরণ

প্রয়াত মীনাক্ষী সেন

কৈশোরের রাজনৈতিক কর্মী, পরবর্তীকালে নারীবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষটি মীনাক্ষী সেন, যাঁর অন্য পরিচয় লেখক হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা— এই দুই বাংলাভাষী রাজ্যে তাঁর পরিচিতি পীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের নানান ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংগ্রামের সাথী হিসেবে। *অনীক*-এর সহযাত্রী এই সুলেখিকার অকালমৃত্যুতে অনীক ব্যথিত। 'জেলের ভেতর জেল'-এর লেখিকা মীনাক্ষী আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন বহুদিন।